দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড

প্রকাশ করেছেন--
শ্রীঅরুণচন্দ্র মজুমদার
দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড
২১, ঝামাপুকুর লেন
কলিকাতা—৯

অক্টোবর
১৯৬৩

ছেপেছেন—
বি. সি. মজুমদার
দেব প্রেস
২৪, ঝামাপুকুর লেন
কলিকাতা—৯

প্রচ্ছদপট ও ছবি এঁকেছেন
শ্রীসরোজ সরকার

— উৎসর্গ —

পরম কল্যানীয়া

প্রভীতি বন্দ্যোপাধ্যায়

মিউকে

॥ এক ॥

বুমবাইর মনটা ভাল নেই। জেঠু রাগ করে চলে গেছে। যাবার সময় জেঠু তার সঙ্গে একটা কথা বলেনি। বুমবাইর যত রাগ এখন মা'র উপর। মা-টা কেমন নিষ্ঠুর। সে বাবাকে খুব ভালবাসে। তার পড়াশুনা নিয়ে বাবার কোন হাকডাক নেই। কেবল একটা কথাই বাবা বলে, তুমি কিন্তু রাঙ্গাজেঠুর মতো বড় হবে। তারপর সহসা জেঠুর উপরই রাগটা গিয়ে তার পড়ল। কেন আসা। দেখছ মা পছন্দ করে না, তুমি এলে আড়ালে মা মুখ ভার করে থাকে—তোমার সামনে মা'র মুখখানা দেখলে কে বলবে, বিছানায় বাবার সঙ্গে সারারাত গজ গজ করেছে—মানুষটার কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই। ঠিক বুমবাইর পরীক্ষার আগে হাজির হবে। আর রাজ্যের যত গল্প, কি খেত, কোথায় যেত, মুড়াপাড়াব হাতি, মেঘনার উত্তাল বর্ষা, কাচকি মাছ, সোনালী ঢাইন—বুমবাইর পরীক্ষাটা প্রতিবার এসে মাটি করে দেয়। আর গাদা গাদা সব বাজার—কে করে! বল কে করে!

বাবা আর না পেরে বলেছিল, এবারে রাঙ্গাদা এলে বলে দেব, তুমি একজন চাকরবাকর সঙ্গে নিয়ে এস। দেশের খাওয়া রান্না করে খাওয়ানো তোমার বৌমার কম্ম নয়। এখন সখটখ বলে আমাদের কিছু থাকতে নেই। সব রেডিমেড চাই। তিলের অম্বল, লাই পাতা দিয়ে শুকতোনি, ভাড়ালির পুড কে কবে খাওয়াবে! একি আমাদের মা-মামীদের সংসার!

বুমবাই ঘাপটি মেরে শুনছিল। জেঠুকে ছোট করতে তার বড় লাগে। জেঠু তাকে নিয়ে বিকেলে বের হয়ে যেত। অদ্ভুত জেঠুর স্বভাব। বুমবাই, এটা কি মাছ বল তো? এটা কি পাখি বল তো? এটা কি ঋতু বল তো? এই ঋতুতে কি সবজি হয় বল তো? কখনও জেঠু সামনের একটা টিলায় দাঁড়িয়ে বল তো, হেঁটে যেতে

পারবি আমার সঙ্গে। মাঠ পার হয়ে চলে যাব। সে অবাক হতো। টিলাটায় দাঁড়ালে যে পৃথিবী দেখা যায়—ততদূরে সে কোনদিন যায়নি। সে পুরী গেছে, দার্জিলিং গেছে, নৈনিতাল গেছে, শিলং গেছে, কিন্তু ওই সামনের মাঠটা পার হয়ে যে বিরাট শালবন আছে সেখানে যায়নি। আশ্চর্য! এ-কথাটা তার এতদিন একবার মনেও হয়নি। জেঠুই তাকে মনে করিয়ে দিয়ে গেল।

পরীক্ষার কটা দিন বুমবাইর খুব খারাপ গেল। একদণ্ড পড়া থেকে উঠতে পারেনি। পরীক্ষাটা শেষ হয়ে গেলে বাঁচা যায়। কিন্তু পরীক্ষার পর আরও খারাপ লাগছিল। বড়দিনের ছুটিতে বাবা এবার কোথাও যাবে না। কারখানার কি সব মেরামতি কাজ চলছে। বাবার ছুটি মেলেনি। এখন তার হাতে অফুরন্ত সময়। রাস্তা পার হলে, সামনে পার্ক, জেঠু থাকলে পার্কে বসে দু'জনে গল্প করত। জেঠু কবে একবার চাইন মাছ শিকারে গিয়েছিল তার গল্প —বুঝলি বুমবাই, নৌকা নিয়ে তো ভেসে গেলাম। বর্ষাকাল। চারদিকে জল। ধানক্ষেত, পাটক্ষেত, মাইলের পর মাইল শুধু জল আর জল। আর সেখানে ধানগাছের মধ্যে কত রকমের কীট-পতঙ্গ। কোনটা সবুজ, কোনটা সোনালী—আর যদি কাচ পোকা পাওয়া যেত, তবে তো কথাই নেই। তোর ছোট পিসির জন্য কৌটোয় পুরে নিয়ে আসতাম। সে-দেশটা তোরা দেখলি না।

বাবা তাকে একটা বল কিনে দিয়েছে। এখন এটা নিয়েই সে পড়ে থাকে। ওপরের ফ্ল্যাটের লাচিন, মিণ্টা নেমে আসে খেলার জন্য। কোয়াটারের সামনে ফাঁকা জায়গাটায় ওরা বিকেলটায় বল পেটায়। বুমবাই ফাঁক পেলেই জেঠুর গল্প জুড়ে দেয়।

আর মাঝে মাঝে মনে হয় কালীদার দোকান পার হয়ে, হাসপাতাল পার হয়ে, সে চলে যায়। টিলার মাথায় দাঁড়িয়ে জেঠু যে সামনের মাঠটা পার হয়ে যেতে বলেছিল সেটা পার হয়ে যায়। কিন্তু একা যায় কি করে!

সে মা-কে একদিন বলল, মা মিচি বাগানের মাঠ পার হয়ে কোথা যাওয়া যায়? মা বলল, কেন সেখানে কি আছে তোমার? মা'র ধারণা, সে সেখানে চলে যেতে পারে।

বাবার ধারণা, সে খুব চঞ্চল। সুস্থির হয়ে একদণ্ড নাকি সে বসতে শেখেনি। আরও কি যে বলে, বুমবাই, রাস্তায় একা বের হবে না! অপরিচিত লোক কিছু খেতে দিলে খাবে না। কেউ সঙ্গে যেতে বললে যাবে না। যেন চারপাশে ছেলেধরা ওৎ পেতে আছে।

আর জেঠু একেবারে অন্যরকমের।—বুঝলি বুমবাই, ফাঁক পেলেই বের হয়ে পড়বি। গাছপালা দেখবি, পাখি দেখবি। নীল আকাশ দেখবি। হেঁটে হেঁটে চলে যাবি যেখানে খুশি মন চায়। সে জেঠুকে নিয়ে ডিয়ার পার্ক গিয়েছিল। জেঠু বলল, কি সুন্দর নারে! আয় আমরা ঘাসের ওপর শুয়ে থাকি। জেঠু হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে পডল। সেও শুয়ে পড়েছিল।

এত জায়গায় বেড়াতে গেছে, কখনও মা—বাবা তাকে ছোট বোন ঝুপিকে এ-ভাবে শুতে শেখায়নি। কেমন ত্রাস সব সময়—ও—মা ও-জায়গাটায় বসে পডলি। ছিঃ ছিঃ, ছাখ তো কি ধুলো-বালি লাগল। সব গিয়ে ধুতে হবে। কত রকমের ইনফেকসান ক্যারি করতে পারে। গাড়িতে যখন যা খাবার, ভাল করে হাত ধুয়ে তবে খাওয়া। কেবল বাধা নিষেধ। সে কোথাও গিয়ে স্বস্তি পায় না। ভাল করে দৌড়াতে পারে না। একদণ্ড চোখের আড়াল হলেই বুমবাই কোথায় গেল?

তার যে মাঠ পার হয়ে যেতে ইচ্ছে করছে। এত বড় মাঠ পার হতে একদিন লেগে যেতে পারে। মাঠের পর শালবন, তারপর সে শুনেছে একটা নদী আছে। গ্রীষ্মের দিনে ওটা বালির চরা হয়ে থাকে। জ্যোৎস্না রাতে ওখানে পরীরা নামে।

লাচিন, মিণ্টা একবার সেখানে পিকনিক করতে গিয়েছিল তাদের বাবা-মার সঙ্গে। এক দেহাতী বুড়ো গল্পটা বলেছিল—পরীরা রাতে উড়ে এসে ওখানটায় খেলে। কেউ দেখে ফেললে, সে রাজা হয়ে

যায়। লোক-লস্কর, ঘোড়সওয়ার, সিপাই-সান্ত্রী কত কিছু—তখন গোপন কথা হয়।

বুমবাই রূপকথার গল্পে ছবিতে এমন কত কাহিনী পড়েছে। জেঠু এলে এ-সব বই দিয়ে যায়। কোন এক দেশে সব গাছপালা মরে যায়। জাদুকর এলে আবার সব গাছপালা পাতা মেলতে থাকে। ফুল ফোটে। পাখিরা উড়ে আসে দূর দেশ থেকে, শস্যক্ষেতগুলি ফসলে ভরে যায়। তার মাঝে মাঝে এমন একজন জাদুকর হতে ইচ্ছা যায়। জেঠু একবার বলেছিল, দেখবি. বলেই দুটো আধুলি ওর পকেট থেকে তুলে নিল। ওমা—ওর পকেট তো খালি। আবার বলেছিল দেখবি, বলেই চারটে আধুলি ওকে দেখিয়ে দিল। অমন একজন জেঠু যার সে তো জাদুকর হতে চাইবেই। কিন্তু মা-টা যে কি না!

বুমবাই টেবিলে চুপচাপ বসেছিল। ঝুপিটা হঠাৎ টেবিলের তলা থেকে থাবা মেরে ছবির বইটা নিয়ে গেল। সে কিছু বলল না। মনটা ভাল নেই। জেঠু এবারে টিনটিনের এই বইটা দিয়ে গেছে। টিনটিন আর তার কুকুর। কি মজার মজার কথা টিনটিনের। সে বার বার পড়ে মজা পায়। জেঠুর জন্য পরীক্ষার পর থেকেই মনটা খারাপ হয়ে আছে। বাবাকে চুপি চুপি বলেছে, আবার কবে আসবে জেঠু?

বাবা বলেছে, দেখ কবে আসে! মর্জি না হলে কোথাও যায় না।

আবার বুমবাই বলেছে, জেঠু এলে চলে যাব।

কোথায় যাবি?

জেঠুর কাছে যাব।

মা শুনে বলেছে, যাও না। জেঠু তোমাকে উদ্ধার করবে। এবারেও তুমি স্ট্যাণ্ড করতে পারবে না। জেঠু এলেই হাতির পাঁচ পা দেখতে শুরু কর। পড়াশুনা কর না। কেবল মানুষটার পায়ে পায়ে ঘুর ঘুর কর।

টিনটিনের বইটা ঝুপি নিচে বিছিয়ে ছবি দেখছে উপুড় হয়ে। অন্য সময় হলে ঝুপির চুল টেনে ধরত, কান মলে দিত এবং মা এসে

বলত, আবার কুরুক্ষেত্র শুরু করলে—কিন্তু আজ সে যেমন বসেছিল, তেমনি বসে থাকল। আজ সে ভাবল জেঠুকে একটা চিঠি লিখবে। কিন্তু মা যদি দেখে ফেলে। জেঠু কত দেশ ঘুরেছে। কত রকমের কাজ করেছে, সমুদ্রে ঘুরে বেড়িয়েছে কতদিন। জাহাজের গল্প, দ্বীপের গল্প, তিমি মাছের গল্প যখন জেঠু বলে তখন সে আর এই বাড়িতে থাকে না যেন। জেঠু তার সত্যি ওয়াণ্ডার ল্যাণ্ড। অথচ মা জেঠুকে দেখলে কেন যে আড়ালে মুখ ভার করে থাকে! বাবার অস্বস্তি। আসলে জেঠু তো বাবার মা'র পেটের ভাই নয়। মামাতো ভাই।

সে তাড়াতাড়ি আজ খেয়েদেয়ে তার নিজের ছোট্ট ঘরটায় ঢুকে গেল। এটা তার নিজের ঘর। দরজা বন্ধ করে চিঠি লিখল, জেঠু, আমারও কোন ভাই নেই। নিজের ভাই না থাকলে কেউ আপন হয় না। তুমি রাগ করে চলে গেলে। বড় সাধ ছিল একদিন তোমার বাবার ছেলেবেলার মতো আমি পান্তাভাত লেবুপাতা দিয়ে মেখে খাই। মা কিছুতেই রাজি হলো না। তোমার ভারি রাগ হলো। আজকালকার বৌমারা বড় স্বার্থপর না জেঠু! আমি কিন্তু তোমার মতো হব। যখন যেখানে খুশি চলে যাব। তোমাকে চুপি চুপি বলে রাখি, আমার পরীক্ষা হয়ে গেছে। কাল লাচিনকে নিয়ে সেই মাঠ পার হয়ে যাব। শালবন পার হয়ে গেলে একটা নদী, নদীর চড়ায় পরীরা নামে। জ্যোৎস্না রাতে ওরা সেখানে খেলা করে। আমি পরী দেখতে যাব। সঙ্গে তুমি থাকলে কী মজাটাই না হতো!

তারপর চিঠিটা ভাঁজ করল সুন্দর করে। চুরি করে বাবার ডাইরি থেকে খাম এনে রেখেছিল। তার উপর ঠিকানা লিখল—আমার রাঙ্গাজেঠু। নিচে লিখল, ওয়াণ্ডার ল্যাণ্ড। তারপর চুপি চুপি ঘর থেকে বের হয়ে গেল। খুব গোপনে চিঠিটা সে নিয়ে যাচ্ছে। পৃথিবীর কেউ জানবে না, সে কাল পরীদের দেশে বেড়াতে যাচ্ছে। কেবল জেঠু চিঠি পেলে জানতে পারবে, তার ভাইপো বড় একজন দুঃসাহসী অভিযাত্রী। জেঠু চিঠিটা পেলে কী না খুশি হবে!

॥ দুই ॥

এবারের বড়দিনের ছুটিতে বুমবাইর মামাবাড়ি যাওয়া হলো না। মন খারাপ। সে তার খাতায় ভেতরের দুঃখটা বড় বড় হরফে লিখল।

মা রান্নাঘরে। সে কী করছে মা টের পাবে না। বড় শীত পড়েছে। ঠাণ্ডা হাওয়া ঢুকছিল। কম্বলটা টেনে গায়ে দিল। তারপর ফের বুকে বালিশ রেখে লিখল, মা, তুমি ভাল না।

সে ক্লাস সিক্সে উঠেছে। এখন থেকে আর তাকে সকালে স্কুলে যেতে হবে না। এটা যে তার কাছে কত বড় খবর মা যদি বুঝত! মামাবাড়ি গেলে দাদু দিদা মামারা দেখতে পেত বুমবাই তাদের কত বড় হয়ে গেছে। ক্লাস সিক্স সোজা কথা না। বুমবাই সিক্সে উঠেছে। পিঠে-পায়েসের চেয়ে এই খবরটা সবাইকে দেওয়া যে তার কত দরকার ছিল মা তা কিছুতেই বুঝল না। শীতের সকালে মা আর তাকে লেপের তলা থেকে টেনে হিঁচড়ে নামাতে সাহসই পাবে না।—ও বুমবাই, ওঠ। তাড়াতাড়ি কর। কিরে কত ঘুমাবি। গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকবে, কী যে হয়েছে ছেলের! যদি এতটুকুন হুঁশ থাকে। তারপর গালাগাল, শেষে টেনে হিঁচড়ে নামানো। মুখ ধুইয়ে দেওয়া থেকে বই খাতা ঠিকঠাক করা তক মা কেমন ত্রাসের মধ্যে থাকে।

স্কুল খুললে, সে সকালে ধীরে-সুস্থে হাত মুখ ধোবে বাবার মতো। চা খাবে, কেক খাবে, তারপর পড়তে বসবে। বাবার মতো মানে বাবা যেমন অফিস যায়—গাড়ি আসে, সেও তেমনি অফিস টাইমে স্কুলের গাড়ি এলে বাড়ি থেকে বের হবে। বাবা বিকেলে ফেরে। সেও স্কুল থেকে বিকেলে ফিরবে। বাবার কাছাকাছি যাওয়া বুমবাইর কাছে খুব গর্বের বিষয়। এমন একটা গর্বের বিষয় দাদুর ইচ্ছে বাবু

জানতে পারল না, সে যে কী আফশোস! বুমবাই খাতার লেখাটা দু-বার পড়ল। একটা সরল রেখা এঁকে নিচে একটা রাস্তা বানাল। সেই রাস্তাটা, যেটা নিচে নেমে যেতে যেতে একটা জলার ধারে গিয়ে শেষ হয়ে গেছে। জলার পাশে একটা নীল রঙের কুটীর। ওখানে কে থাকে? দাদুর ইচ্ছেবাবু কিছুতেই তা বলতে চায়নি। ইচ্ছেবাবু বলেছিল শুধু, বাবার মতো বড় হও জানতে পারবে।

বুমবাই উবু হয়ে শুয়ে খাতায় আঁকিবুকি করছে। গায়ে ফুল সোয়েটার। মাসির হাতে বোনা। এবারে গেলে আর একটা সোয়েটার হতো—ধুতুরি সোয়েটার—তার আসল খবরটাই দেওয়া হলো না, তার আবার সোয়েটার! সে হঠাৎ পাতাটা ছিঁড়ে ফেলল। মনটা বড় উসখুস করছে। পড়া নেই, ছুটি। আজ সকালেই বাবা খবরটা দিল, এবারে যাওয়া হবে না। কারা নাকি আসছে কী সব পরীক্ষা করতে কারখানায়। খবরটা পাবার পরই সে মনমরা হয়ে গেছিল। উপরের ফ্ল্যাটে গিয়েছিল খবরটা দিতে। দরজায় পৌঁছে মনে হলো, ওরা তো নেই, মাসির বাড়ি গেছে। পরীক্ষা আর প্রমোশন হয়ে গেলে কেউ বাড়ি থাকে না।

অভিমানে চোখ দুটো টসটস করছে বুমবাইর। সিঁড়ি ধরে নামছিল। দরজা ফাঁক করে কেউ তাকে দেখছে।—কে রে? ঝুপি! ঝুপি ছোট্ট দু' বিনুনির ছবিতে আঁকা তার বোন। বলল, দাদা, মা ডাকছে।

ডাকুকগে। আমি যাব না। কোথাও আর যাব না।

যেতে বলবে না রে।

আমি কোন কাজ করতে পারব না। কিছু করব না।

মা আজ পিঠে করবে। মামাবাড়ি যেতে পারেনি বলে মা'র মন খারাপ জানিস।

মন খারাপ না ছাই।

কারণ বুমবাই জানে, মা'র কথা বাবা কখনও ফেলতে পারে না। ছোট কাকুকে মা পছন্দ করত না। থাকতে পারল! তাকে চলে

যেতে হলো না! তবু কাকুটা যে কী—একবার সন্ধ্যায় না এসে পারে না। সে যা ভালবাসে কাকু নিয়ে আসে। ঝুপিটা নাকি মা'র স্বভাব পেয়েছে। ঝুপিকে কাকু কিছু দিতে চায় না। সব লুকিয়ে-চুরিয়ে আনে, দিয়ে যায়। টফি লজেন্স, ছবির বই, স্কেচ পেনসিল, রঙের বাক্‌স—কত কিছু। মা'র ইচ্ছের উপর সংসারে আর কারো কোন ইচ্ছে যেন থাকতে পারে না। জেঠু সেই যে এসেছিল—কী যে হলো তারপর, দু'দিন থেকেই চলে গেল—অনেকদিন আর এমুখো হয়নি। মা-কে তার তখন বড় নিষ্ঠুর মনে হয়। বাবার কুটুম এলেই মা'র মুখ হাঁড়ি। বাবাও বড় তখন অস্বস্তিতে পড়ে যায়। তার ইচ্ছে হয় তখন, সব ছেড়েছুড়ে কোনদিকে সে চলে যায়। এমন অবুঝ মা, ভগমান, মানুষের কেন হয়!

জেঠু এলে তার কী যে ভাল লাগে মা-টা একদম বোঝে না। যেন অজস্র গাছপালা প্রজাপতি আর ইস্টিকুটুম পাখি ঝোলায় করে হাজির। সে যা চাইবে, জেঠু যেন তাই বের করে দেখাবে ঝোলা থেকে। কত হ্রদের নাম বলবে, সমুদ্রের সব গোপন পাহাড়ের খবর দেবে। কোন্ দেশে কী পোকা-মাকড় থাকে—পাখিরা বাসা বানায় ফুলের পাপড়ি দিয়ে, আরও কত সব খবর—সুদূর এক দ্বীপমালা আর সবুজ ঘাসের মাঠ, তাকে নিয়ে নাকি যাবে সেখানে—সেই জেঠুটাও আসে না। না আসুক, একদিন সেও যাবে বের হয়ে। কোন গাছ-তলায় গিয়ে শুয়ে থাকবে—বুঝবে মা তখন। জেঠু বনজঙ্গলের গল্প বলবে। সারাদিন হেঁটে বড় মাঠ পার হওয়ার মধ্যে নাকি অন্য এক জয়ের স্বপ্ন থাকে—কত কথা জেঠুর! জেঠুটা এলেও সে বেঁচে যেত।

একবার সে জেঠুর নাম করে একটা চিঠি ছেড়ে দিয়েছিল। চিঠিটায় ঠিকানা ছিল, আমার জেঠু। খামের উপরে প্রজাপতির ছবি আর গাছপালার সঙ্গে একটি ছোট্ট ছেলের মুখ এঁকে দিয়েছিল। চুপিচুপি ডাকবাক্‌সে চিঠিটা ফেলে এসে বাবাকে বলতেই, বাবার কি হাহাকার হাসি! ধুস বোকা, ওতে কোন চিঠি যায়! বুমবাই তখন অত জানে না সব।

এখন বুঝতে পারে সে খুবই ছেলেমানুষী করে ফেলেছিল। মানুষের কোন না কোন ঠিকানা থাকে। বনজঙ্গল এঁকে দিলেই ঠিকানা হয় না। আমার প্রিয় জ্যাঠামশাই লিখলেও হয় না। কিন্তু আশ্চর্য, চিঠি ডাকবাক্সে ফেলার ক'দিন পরই জেঠু হাজির। বলেছিল, তোর চিঠি পেয়ে থাকতে পারিনি। গাছপালা আঁকা, প্রজাপতি আঁকা, আমার জেঠু।

কিন্তু বুমবাই ভেবে পায় না, জেঠু সেই চিঠি পেল কী করে! যত বড় হচ্ছে, জেঠুকে মনে হচ্ছে যেন তিনি অন্য এক গ্রহের মানুষ। জেঠুর গায়ের গন্ধেও আছে বুনো ফুলের সুবাস।

আজ প্রথম সে ভাবল, বাবা অফিস থেকে ফিরে এলে জেঠুর ঠিকানা চাইবে। জেঠুকে খবরটা দিতেই হবে। জেঠু, এবারে আমি ক্লাস সিক্সে উঠিয়াছি। এখন আমি সকালের স্কুলে যাইব না। বাবার মতো দশটায় স্কুলে যাইব। ক্লাস সিক্স সোজা কথা না। জেঠুকে এত বড় খবরটা না দিয়ে থাকা যায়! সবাইকে চিঠি লিখতে হবে। দাদুর ইচ্ছেবাবুকে পর্যন্ত। জেঠুর চিঠিটাতে ঠিকানা লিখবে গোটা গোটা অক্ষরে। পাশে ছবি আঁকবে কোন গ্রহাণুর। তার ছবি আঁকার হাত কত আরও ভাল হয়েছে, গ্রহাণুটা দেখলে জেঠু টের পাবে। কারণ সে তো ভেবে থাকে জেঠু থাকে তার সেই ছোট্ট গ্রহানুতে। যা সে গোপনে বুকের মধ্যে বয়ে বেড়ায়। জেঠুই বাবাকে মনে করিয়ে দিয়েছিল, বুমবাই বড় সুন্দর ছবি আঁকে। বড় সুন্দর হাত।

বাবার কী আক্ষেপ তখন—জানো না দাদা, কিছু করে না। দিনরাত এই ছবি আঁকার বাই।

জেঠু কেমন গম্ভীর গলায় বলেছিলেন, কী বললি! ও-কথা আর বলিস না। ওটা না থাকলে জীবনে মুক্তি থাকে না।

মা ভেতর থেকে ফোড়ন কেটেছিল, যেমন মানুষ, তার তেমন ভাইপো। পড়াশোনায় মন দেবে কোত্থেকে! ভাগ্যিস জেঠু তার কানে কম শোনে!

বাবাও কেমন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছিল জেঠুর কথায়। কোথায় জেঠু তাকে শাসন করবে তা না, কেমন আরও আসকারা দিয়ে গেল। তারপর জেঠু নিয়ে এসেছিল ধূর্ত খেঁকশিয়ালের ছবিয়ালা এক বই। সঙ্গে একটা কুঁড়েঘর আর দু'জন বুড়ি মতো মানুষ। পাশে লম্বা একটা গভীর বন কতদূরে চলে গেছে। জেঠু বলেছিল, ওগুলো পাইন গাছ। বরফের সময় গাছগুলো এক-একটা রাজার লম্বা রুপোর মুকুট হয়ে যায়। তারপর জেঠু আর একটা বই এনে দিয়েছিল। বইয়ের নাম, 'জাদুকর বসন্তনিবাস'। মলাটে ছোট্ট মেয়ে ম্যাণ্ডেলা এবং একটা ক্যাঙ্গারুর বাচ্চা—নাম হাইতিতি। কী জীবন্ত! কতদিন একা একা ছবির ম্যাণ্ডেলার এবং হাইতিতির সঙ্গে চুপচাপ নিরিবিলি ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প করেছে। বলেছে, তোমার হাইতিতিকে আমায় দেবে! আমি তোমাকে তা'লে সুন্দর একটা ছবি উপহার দেব।

ম্যাণ্ডেলা বলেছে, নাও না।

সে ম্যাণ্ডেলাকে একটা ছবি এঁকে উপহার দিয়েছিল। বইয়ের পাতার ভেতর রেখে দিয়েছে। কাউকে দেখায়নি পর্যন্ত। গোপনে সে কাজটা করেছে। এইভাবে তার ম্যাণ্ডেলার সঙ্গে চুপচাপ কখনও বন্ধুত্ব, কখনও আড়ি, কখনও হাত ধরাধরি করে ছুটতে ছুটতে বলেছে, এই আমাদের স্কুলের মাঠ, এই দেখ পার্ক, এখানে একবার ইস্টবেঙ্গল খেলতে এসেছিল। এই দেখ শাল গাছ, মহুয়া গাছ। আমাদের বড় দিদিমণির মুখ ব্যাঙাচির মতো। তারপরই, মনে আছে, এক বিকেলে ঘরে ফিরে হঠাৎ সে ঝুপিকে দেখে ভেবে ফেলেছিল, আরে ঐ তো ছবির মেয়েটা জ্যান্ত হয়ে নেমে এসেছে। মা ডাকে, ঝুপি, কাজেই সে আর তাকে ম্যাণ্ডেলা ডাকে কী করে! এবং তারপরই, মনে আছে ঝুপি বলেছিল, দাদা, তোর সেই ছবিটা আমায় দিবি?

কোন্ ছবিটা রে?

ঐ যে একটা মেয়েকে কারা জলার ধারে নীলকুঠিতে আটকে রেখেছে।

ওটা তো সে ম্যাণ্ডেলাকে দিয়েছে। পরে মনে হয়েছে, ঝুপিই যখন ম্যাণ্ডেলা, তখন ছবিটা তারই প্রাপ্য। ঝুপি কিংবা ম্যাণ্ডেলা দু'জনেই তার কাছে এক। সে ঝুপিকে ছবিটা দিয়ে দিয়েছিল। আর ঝুপি সেই ছবিটায় প্যাচিয়ে যখন তার ক্যাডবেরি নিয়ে গেছিল স্কুলে, তখন তার কী কান্না।

সে এখন বড় হয়ে গেছে বলে ও-সব ভেবে মনে মনে হাসে। আগে জাদুকর বসন্তনিবাসের কাছে সে কত কিছু চাইত। এখন আর চাইতে পারে না। আমাকে একটা সোনার পালক দাও। ওটা পরে উড়ে যাই। বড় হয়ে গেলে কারো কাছে কিছু চাওয়াও যায় না। চাইলে ছোট হতে হয়। ছোটরাই অন্য লোকের কাছে কিছু নিতে চায় না—আর সে তো বড় হয়ে গেছে। ক্লাস সিক্সে উঠেছে—সোজা কথা না। তবু নিভৃতে থাকে গোপন ইচ্ছে—সেই গ্রহাণুতে রাখা তার জেঠুর মতো গোপন প্রার্থনা তার, জাদুকর বসন্তনিবাস, আমাকে একখানা সোনার পালক দাও। ওটা পরে মামাবাড়ি উড়ে যাই। ইচ্ছেবাবুকে বলে আসি, আমি বড় হয়েছি, আমি ক্লাস সিক্সে উঠেছি—ঐ যে নীলকুঠির মতো কুঁড়েঘরটায় কারা থাকে—তুমি বলেছিলে বড় হলে বলবে।

দূর থেকে ইচ্ছেবাবু যেন বলল, তুমি বড় হওনি।

না, বড় হয়েছি। জেঠুকে ডাকব। গ্রহাণুতে আমার জেঠু থাকে।

ডাক না। জেঠু তোমার কিছু জানে না। কেবল খেতে জানে। খাওয়া আর খাওয়া। খাওয়াটাই সার জেনেছে।

বুমবাইর রাগ হয়। জেঠু খেতে ভালবাসে ঠিক। বাড়ি এলে মা-কে এটা ওটা করে খাওয়াতে বলে। মা বিরক্ত হয়। তার তখন কী যে কষ্ট!

সে বলল, জেঠু সব জানে। তুমি কিছু জান না।

ইচ্ছেবাবু বলল, জানি না, বেশ। তবে জেনে রাখ কুঁড়েঘরটায় ডাইনি থাকে। বুমবাই রেগে গিয়ে বলল, জেঠু বলেছে, ডাইনি বলে কিছু নেই। রাক্ষস বলে কিছু নেই।

এই রে! সব দেখি টের পেয়েছে। বলেই মুরুব্বি চালে ইচ্ছেবাবু লেজ মোটা করে সরে পড়ল। লেজ দু'বার চোখের সামনে নাচাল, তারপর একটা আস্ত হনুমান হয়ে গেল ইচ্ছেবাবু। ধুস, এতসব জানালায় দেখার চেয়ে জেঠুকে চিঠি লেখা ভাল। লিখল, জেঠু, এবারে আমাদের মামাবাড়ি যাওয়া হয়নি, তুমিও আসনি। আমার সময় কাটছে না। লেখাটা বড় ন্যাড়া ন্যাড়া। সে পাশে ছবি আঁকল জেঠুর। হাফ হাতা শার্ট গায়, হাতে পুঁটুলি, পায়ে নাগরাই জুতো। কাঁচাপাকা চুল। জুতোর দু'মাথায় দুটো প্রজাপতি এঁকে দিল। বাবার ইচ্ছেতে নয়, মা'র ইচ্ছেতে এবারে মামাবাড়ি যাওয়া হয়নি। নিজে এমন লিখল। তবু ন্যাড়া ন্যাড়া। ইচ্ছেবাবুর ছবি আঁকল পাশে—বুনো ওলের মতো মাথা, বাঁকা তেঁতুলের মতো ওরাংওটাং লেজ। সে তারপর নিজেই হা হা করে হাসতে থাকল। দাদার খিলখিল হাসি শুনে ঝুপি বিছানায় লাফিয়ে উঠে বসল। বলল, দাদা, তুই হাসছিস কেন রে! বুমবাই বলল, এই ছাখ্ না, এটা ইচ্ছেবাবু, এই আমার জেঠু। এখানে ছাখ্ আছে ক্যাঙ্গারুর বাচ্চাটা। আর এই যে ম্যাণ্ডেলা, চুলে সোনার পালক, যেখানে খুশি উড়ে চলে যেতে পারে। দেখবি একদিন ম্যাণ্ডেলার মতো কোথাও আমি চলে যাই। তখন তুই কাঁদবি—হাই হাই দাদারে!

॥ তিন ॥

বুমবাই যে এখন কী করবে ঠিক বুঝতে পারছে না। আজও পিওন বলল, না খোকাবাবু, তোমার কোন চিঠি নেই। সে রাঙ্গাজেঠুকে এত সুন্দর করে একটা চিঠি লিখেছে, চিঠিতে সে ইচ্ছেবাবুর ছবি পর্যন্ত এঁকে দিয়েছিল, লিখেছিল, "জেঠু, এবারে আমাদের মামাবাড়ি যাওয়া হয়নি। পুজোর ছুটি শেষ হলে প্রত্যেকবারই তুমি একবার আস, তাও এলে না। আমার খুব মন খারাপ। এবারে আমি ক্লাস সিক্সে

উঠেছি। সিক্সে ওঠা কত বড় কথা, নিশ্চয়ই তুমি বোঝ। আমাকে আর সকালে উঠে স্কুলে যেতে হবে না। এখন আমার দুপুরে স্কুল। বড়দিনের ছুটি চলছে। আমার সময় কাটছে না।"

এর আগেও বুমবাই তার জেঠুকে চিঠি দিয়েছিল। সে চিঠিটা জেঠু পায়নি। সে তখন আরও ছোট। কী করে বুঝবে যে, কাউকে চিঠি লিখতে হলে নাম-ঠিকানা দিতে হয়। সে শুধু খামের উপর লিখেছিল, 'আমার জেঠু ; গায়ে তার সমুদ্রের গন্ধ।' এমন একটা চিঠি যে জেঠু ছাড়া আর কারো কাছে যেতে পারে তা সে বুঝতে পারেনি। কিন্তু ক্লাস সিক্সে ওঠার জন্য তাকে চিঠি লেখা শিখতে হয়েছে।

চিঠিটা লিখে ওর মনে হয়েছিল, কেমন যেন কোথাও খুঁত আছে। সেজন্য পাশে ছবি এঁকে দিয়েছে। ছবিটা ইচ্ছেবাবুর! বুনো ওলের মতো মাথা, বাঁকা তেঁতুলের মতো ঠ্যাং। সঙ্গে সে একটা ওরাংওটাং-এর লেজ এঁকে দিয়েছিল। জেঠু যেন বুঝতে পারে, বুমবাই শুধু ক্লাস সিক্সেই ওঠেনি, সে এখন একজন মস্ত বড় শিল্পী। এত বড় খবরে জেঠুর মতো এত বেশি খুশি আর কেউ হতে পারে, পৃথিবীতে এমন কাউকে সে জানে না। সেই জেঠু, যিনি এসেই সারা পৃথিবীর গল্প জুড়ে দিতেন—জাহাজের গল্প, নাবিকদের গল্প, আর সেই জাদুকর বসন্ত-নিবাস থেকে ম্যাণ্ডেলা, কেউ বাদ যেত না। বড়দিনের ছুটিতে জেঠু কাছে থাকলে কী মজাটাই না হতো। ম্যাণ্ডেলার পালকের টুপি, হাওয়ায় ভেসে বেড়ানো, এমন কত না মজার গল্প। সে ভাবল, জেঠুকে আর-একটা চিঠি লিখলে কেমন হয়।

জেঠু এলে মা কেমন আড়ালে মুখ গোমড়া করে থাকে। মা-টা যে কী! জেঠু ভালমন্দ খেতে ভালবাসেন। দেশের বাড়িতে লাউশাক থেকে শাপলার শুক্তোনি, এমন কী কচি আম দিয়ে টকের ডাল কী করে রাঁধতে হয়, তাও মা'কে শিখিয়ে দিয়েছিলেন জেঠু। বলেছিলেন, "বউমা, রোজ-রোজ ছেলেকে ডিম-টোস্ট দেবে না। সকালে কাঁঠালবিচি সেদ্ধ দিয়ে গরম ভাত দেবে। তাতে শরীরের পুষ্টি হয়।" এসব কথা শুনে আড়ালে মা'র কী হাসি!

বুমবাই জানে, মা টা তার এইরকমই। জেঠুর কিছুই পছন্দ নয়। জেঠু একবার এসে বাড়িতে ঢুকেই হায়-হায় করে উঠেছিলেন—এ কী চেহারা হয়েছে ছেলেটার! বাবার এক কথা, "কী করব বলো, কিছু খেতে চায় না। ডাক্তার দেখছে। কিছু হচ্ছে না। খেতে বসলেই ওর নাকি বমি পায়। কত টনিক, পিল খাওয়াচ্ছি—কোন কাজ হচ্ছে না।"

জেঠু গুম হয়ে বসে থাকলেন কিছুক্ষণ। তারপর বের হয়ে গেলেন। ফিরলেন দুপুরে। কোঁচরে যত বনজঙ্গলের গাছপাতা জড়ো করে হাজির। মা-কে বললেন, "শিল-নোড়া আছে তো? থাকলে দয়া করে দাও।"

এমন একটা হাল-ফ্যাশানের নতুন শহরে যে এসব লাগে না, জেঠু কী করে বুঝবেন। তবু মা গিয়ে নিনিদের ফ্ল্যাট থেকে শিল-নোড়া চেয়ে আনলেন। তখন জেঠু বললেন, "কাজের মেয়েটাকে বলো মিহি করে বাটতে।"

বাবা অফিস থেকে এলে জেঠু বললেন, "ছেলেটাকে কি তোরা মেরে ফেলার ষড়যন্ত্র করেছিলি?"

বাবা অবাক জেঠুর কথায়! জেঠুর তখনও কড়া মেজাজ। "তোরা তো টনিক পিল খেয়ে বড় হয়েছিস! সকালে উঠে দু'চামচ চিরতার জল দিতে তোদের এত কষ্ট! অগ্নিমান্দ্য বলে একে। কালোমেঘের পাতা নিয়ে এলাম। বেটে বড়ি করে খাওয়া। দেখবি তখন ভাতের থালা ছেলের পিছু ঘুরছে না, ছেলেই তোমার ভাতের থালার পিছু ঘুরছে।"

হলোও তাই। বাপ্ রে। ক'দিন যেতে-না-যেতেই সে কী রাক্কুসে খিদে! যাবার সময় চিরতা আর একঠোঙা ধনে কিনে দিয়ে বলেছিলেন, "ভিজিয়ে রাখবে। সকালে উঠে এক ঝিনুক চিরতার জল চিত করে ফেলে খাওয়াবে। এমনিতে তো খাবে না।" সেখানেও শেষ নয়। চিরতা ভেজাবার পাত্রটির খোঁজ করলেন। মা স্টিলের বাটি নিয়ে এলে খেপে লাল। "দুটো বাচ্চার মা তুমি,

চিরতা কিসে ভেজাতে হয়, জানো না? পাথরের বাটি-টাটি নেই?"

থাকবে কোত্থেকে! পাথরের বাটি সংসারের কাজে লাগে, মা জানেনই না। জেঠু নিজেই বেনাচিতির বাজার থেকে সাদা পাথরের বাটি কিনে দিয়ে গিয়েছিলেন। সুতরাং এমন মানুষ বাড়ি এলে যে বিড়ম্বনা বাড়বে, মা তা ঠিক টের পান। এবার পুজোর ছুটিতে জেঠু আসেননি বলে মা হাঁফ ছেড়ে যেন বেঁচেছেন। "যাক, তেনার তবু দয়া হয়েছে। বুঝতে পেরেছেন, ছুটি শেষ হলেই ভাইপোর পরীক্ষা। আজগুবি সব গল্প বলে ভাইপোটির মাথা চিবিয়ে খেতেন, তার থেকে রক্ষে পাওয়া গেছে।"

বুমবাইর যে কী রাগ হয় না তখন মায়ের উপর! হাত-পা ছুঁড়ে বলবে, "তুমি কক্ষণো আমার জেঠুর নিন্দেমন্দ করবে না। জেঠু আসে বলেই তো কত রকমের আমরা খাবার খেতে পাই। ইলিশ-ভাতে কখনও করতে জানতে? জেঠু এসেই তো শিখিয়ে দিল।"

মা'র তখন এক কথা। "ও আমরা সব জানি। করেটা কে! একটা লোক পাওয়া যায় না। তোমরা কী বুঝবে। রান্নার বই কিনেছি, করে খাওয়াব।"

জেঠু সম্পর্কে নিন্দেমন্দ হলে বোন ঝুপিটাও দাদার পক্ষ নেয়। ভাই-বোন মিলে বলবে, "জেঠু আসবে। একশোবার আসবে। দাঁড়াও না, জেঠুকে একটা চিঠি লিখেছি আসতে, যদি না আসে, আবার চিঠি দেব।"

মা'ও তখন খেপে যান। হ্যাঁ, আসুক আর জ্বালাক। বউমা, এই ভাখো, গিমেশাক নিয়ে এলাম, বেশ অল্প তেলে মুচমুচে করে বেগুন দিয়ে ভাজবে। আমি যে ঘি-টা এনেছি, ওটা সবার পাতে-পাতে দেবে। ভাতটা কিন্তু গরম হওয়া চাই। অর্ডারের পর অর্ডার।

তারপরই মা'র কেমন আরও মাথা গরম হয়ে যায়। "আরে বাবা, দেশে কে কী খেয়ে বড় হয়েছে, মনে করে বসে থাকলে চলে! সংসারে তখন কত লোকজন। তোমার বাবার তো ছ'সাতজন মামাই

ছিল। তাদের বউরা, তাদের ছেলেমেয়ে, সব মিলে ত্রিশ-চল্লিশজন বসে খেত। অভাব ছিল না কিছুর। যেদিনকার যা, তা হয়েছে। তোমার বাবা তো মামাবাড়িতেই মানুষ। আর সেই সুবাদে বছর-বছর আমাকে জ্বালাতে আসে তোমার জেঠু।"

বুমবাই জানে, জেঠু বাবার মামাতো ভাই। জেঠুর দুই ছেলে। একজন বাইরে। সেই কোন্ মার্কিন মুল্লুক বলে একটা দেশ আছে, সেখানে স্কলারশিপ নিয়ে চলে গেছে। জেঠু এলেই বাবার এক কথা, "দেখছ তো, দাদারা তোমার কত বড় হয়েছে। বারো ক্লাসে তোমার বাবুলদা তো অঙ্কে একশোতে একশো পেয়েছে।"

জেঠুর তখন ধমক, "ধুস, ওটা কোন খবর! বুঝলি বুমবাই, সেই যে ম্যাণ্ডেলা, সে এবারে কোথায় গেছে জানিস?"

"কোথায় গেছে?"

"একটা জাহাজে। বুড়ো একটা লোক দ্বীপে আটকা পড়ে আছে। তাকে উদ্ধার করতে হবে তো!"

মা তখন রান্নাঘর থেকে গজগজ শুরু করবেন। "হয়ে গেল! পড়াশোনা মাথায় উঠল! এখন সারাদিন চলবে ম্যাণ্ডেলার সব আজগুবি অভিযানের কথা। কী যে জ্বালা হয়েছে আমার!" জেঠু একটু কানে কম শুনতে পান বলে রক্ষা।

মা'র গজগজ চলছেই। "পালকের টুপি না ছাই। আরে, মানুষ কখনও পালকের টুপি পরে উড়ে যেতে পারে? ছেলেটাও হয়েছে তেমনি। জেঠু যা বলবে, সব ঠিক। জেঠু মিছে কথা বলতে পারে না। জাদুকর বসন্তনিবাস বলে কেউ থাকতেই পারে। পালকের টুপি পেলে সেও যেন উড়ে যেতে পারত।"

বাড়িতে অনেকক্ষণ হলো বুমবাইর সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। কী করছে! মা ডাকলেন, "বুমবাই, কী করছিস?"

সাড়া নেই।

আবার রান্নাঘর থেকে মা ডাকলেন, "কী রে, সাড়া দিচ্ছিস না কেন?"

তখন ঝুপি এসে চুপিচুপি বলল, "মা, জানো, দাদা না জেঠুকে চিঠি লিখছে।"

"চিঠি লিখছে! দাঁড়াও, দেখাচ্ছি।" বলেই ছুটে বের হয়ে বসার ঘরে ঢুকে মা যা দেখলে, তাতে একদম হাঁ। মূর্তিমান জেঠু নিজেই হাজির। জানলায় দাঁড়িয়ে ডাকছেন, "বুমবাই, দরজা খোল্! এই যে বউমা, চলে এলাম।"

বউমা আর কী করেন! মাথায় সামান্য ঘোমটা তুলে দরজা খুলে দিয়েই অবাক। হাতে বিশাল একটা হাঁড়ি। মালসা দিয়ে ঢাকা। ঝুপি লাফিয়ে দাদার ঘরে ছুটে চলে গেছে। "ও দাদা, শিগগির আয়, জেঠু এসে গেছে!"

বুমবাই ভাবল, মিছে কথা! সে বলল, "আমার সঙ্গে ইয়ার্কি হচ্ছে! দাঁড়া, বাবা আসুক, যদি না বলেছি· · · "

আর তখনই প্রায় স্বপ্ন দেখার মতো সে দেখতে পেল, সেই লম্বা দীর্ঘকায় মানুষটি হাজির। গায়ে ফতুয়া। পায়ে পাম্পশু। হাঁটুর নিচে কোনরকমে কোঁচাটি ঝুলছে।

"ও জেঠু, আমার জেঠু," বলে বুমবাই ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইলে তিনি একটু সরে দাঁড়ালেন। বললেন, "দাঁড়া।" বলে বউমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "এটা ভিতরে নিয়ে রাখো। পারবে তো? খুব ভারী। দেখো আবার রাখতে গিয়ে যেন ভেঙে-টেঙে না যায়।"

বুমবাই বলল, "কী আছে ওতে?"

"ক'টা কইমাছ। অঘ্রান-পৌষে কইমাছ খেতে খুব সুস্বাদু। নিয়ে এলাম, পুকুর থেকে তোলা। খেলে বুঝবি, কী জিনিস!"

ও-সব দেখার সময় নেই বুমবাইর। সে ফ্যানটা ছেড়ে দিয়ে বলল, "তুমি বোসো। আমি নিয়ে যাচ্ছি।"

"পারবি না বাবা। ট্যাক্সিঅলাই পারেনি।" তারপর বউমার পলকা শরীরের কথা ভেবে বলেন, "দাঁড়াও, আমিই রেখে আসছি।"

এমন একটা বিশাল হাঁড়িতে যে শুধু কইমাছ নেই, আরও কিছু আছে, বুঝতে বউমাটির কষ্ট হলো না। আর যখন সেটি রান্নাঘরে রেখে

বুমবাই বলল, "কী আছে ওতে?" [পৃঃ ১৭

বের হয়ে এল মানুষটি, মালসা তুলে বউমার মাথায় হাত। বিঘতপ্রমাণ সব অতিকায় মাছ। এ মাছ কুটবে কে? একটা মাছ তো লাফিয়ে

বউমার নাকে এসে গোঁত্তা খেল। জল থেকে লাফিয়ে প্রথমে নাকে গোঁত্তা, পরে হাঁটাহাঁটি। মাছটা ধরতে গিয়ে মালসাটা নিচে রাখতেই হয়। ওটা যে ঢেকে রাখার নিয়ম, বউমাটি তা জানবে কী করে! আর ধরতে গিয়ে আরও বিপদ। ততক্ষণে জল থেকে লাফিয়ে টপাটপ সব ঘরময় হয়ে যাচ্ছে। একটাকেও ধরতে পারছে না। কানকো দিয়ে হাতে আঁচড়ে দিতেই রক্তপাত শুরু হয়ে গেল। আর তখন মাছগুলোও স্বাধীন হয়ে গেছে। খলবল করছে, আর হাওয়ায় উড়ে এসে মেঝেতে পড়ছে। কাজের মেয়েটা ছুটে এসে বলল, "ও বাবা, কী করেছ হাতটা বউদি!"

বউমা ধমক লাগাল, "চুপ কর্ তো! ওঃ, কী যে করি! সারা ঘর হয়ে গেল। তুলতে পারছিস না? হাবার মতো দাঁড়িয়ে তামাশা দেখছিস!"

"তুমি পারছ?"

"কাঁটা মারছে। ওঃ, কী জ্বলছে হাত!"

একটা কই কখন কোন্ ফাঁকে হাঁটতে-হাঁটতে বসার ঘরে এসে হাজির।

কাজের মেয়েটি বলল, "কর্তাবাবুকে ডাকি!"

"চুপ! এসেই বলবেন, "তোমরা আজকাল বউমারা কী যে হলে! সামান্য কইমাছের কাছে তোমরা এমন জব্দ।"

বুমবাই বলছিল, "আচ্ছা জেঠু, ম্যাণ্ডেলা এখন বড় হয়ে গেছে না?"

তখন রান্নাঘরে হুলুস্থুল কাণ্ড। বসার ঘর থেকে কেউ সেটা টের পাচ্ছে না। দু' হাতে সাপটে ধরছে বউমা এক-একটা কইমাছ। আর কানকোর আঁচড় খেয়েই ছেড়ে দিচ্ছে। কেবল বলছে, "মাগো! কী জ্বালা করছে হাত।" খুব নিচু গলায়। শুনলে তিনি তো এক্ষুণি ছুটে আসবেন। আর দশটি অনুযোগ শোনাবেন। কার ভাল লাগে!

জেঠু বলল, "মুশকিল কী জানিস, ম্যাণ্ডেলা বড় হবে কী করে! ও তো ওর বাবাকে এখনও খুঁজে পায়নি।"

বুমবাইর কাছে জেঠুর এমন কথা বড়ই অকাট্য যুক্তি মনে হয়। সে বলল, "সত্যি, বাবাকে খুঁজে না পেলে বড় হবে কী করে!" আর তখনই কী যেন পায়ে সুড়সুড়ি দিচ্ছে। সেণ্টার টেবিলের নিচে একটা কইমাছ। কার্পেটের গা বেয়ে উঠে আসছে।

সঙ্গে সঙ্গে জেঠুর গলা সপ্তমে চড়ে গেল, "ও বউমা, কইমাছ এখানে কেন!" বলে মাছটার মুখের দিক থেকে হাতটা এগিয়ে মাথাটা চেপে ধরে মুঠোয় ভরে রান্নাঘরে দিয়ে আসতে গেল। ভিতরে গিয়ে হাঁ। সারা ঘরময় মাছগুলি নির্বিঘ্নে হেঁটে বেড়াচ্ছে। কাজের মেয়েটা রাশি-রাশি ডেটল ঢালছে বউমার হাতে। আর পাখার হাওয়া করছে। বউমা কিন্তু 'আঃ, উঃ' কিছু করছে না। দাঁত চেপে হাত ঝাড়ছে কেবল।

বুমবাই ঝুপি দু'জনেই পেছনে এসে দেখছে, কষ্টে মা'র চোখে জল এসে গেছে।

জেঠু উবু হয়ে প্রথমে মালসাটা দিয়ে হাঁড়িটা ঢেকে দিলেন। বললেন, "বউমা, ছেলেরা ভালমন্দ কী আর খাবে! সামান্য কটা কইমাছের কাছেই তুমি এমন জব্দ। দেখি হাতটা! ইস, কী করেছ! সরো দেখি।" বলে উবু হয়ে বসলেন। "এই ছাখো, মাথার দিক থেকে হাত দেবে। ছাখো। দেখছ তো, কীভাবে ধরছি? মাথাটা চেপে ধরলেই ঠাণ্ডা।" বলে মালসা তুলে মাছটা রাখলেন। আবার মালসাটি ঢেকে অন্য একটি মাছ এবং এই করে করে সব কটিকে আবার হাঁড়িতে রেখে, বউমা'র সামনে হাতটা খুলে দেখালেন। "কই, হাতে কোন আঁচড় লেগেছে?"

সেবার বুমবাই আর ঝুপির ভাতে-সেদ্ধ কই, কইমাছের পাতুরি, ইত্যাদি সব খাওয়া হলো ঠিকই, তবে মা-কে কিছু করতে হয়নি। মা তো দু' হাতে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে সেই যে বিছানা নিলেন, আর উঠলেন না। সঙ্গে এ. টি. এস.। কাজের মেয়েটা কইমাছ কাটতে জানে না। তেমন ধারালো বঁটিও বাড়িতে নেই। কাটাপোনা ছাড়া অন্য মাছ আনার নিয়ম তো এ-বাড়িতে নেই। বাবা মিনিদের বাড়ি থেকে বঁটি

ধার করে আনলেন। জেঠু নিজে কীভাবে কইমাছ কাটতে হয় বাবাকে বসে বসে শেখালেন। পাতুরি দিয়ে গরম ভাত বেড়ে জেঠুই খাবার টেবিলে রেখে ডাকলেন, "ওঠো বউমা, খেয়ে নাও।" বাবা মা'র মাছ বেছে দিলেন। এবং চামচ দিয়ে মাকে বাবা ভাতও খাইয়ে দিলেন।

যাবার দিন জেঠু বললেন, "বেশ কাটল বুমবাই। কতদিন নিজের হাতে রান্নাবান্না করে খাইনি। এই খাওয়ার মধ্যে কত যে আনন্দ কেউ বোঝে না।"

জেঠু চলে যাবার সময় বুমবাই একটা কথাও বলতে পারল না। কেবল ভ্যাক করে কেঁদে ফেলল। জেঠু ট্যাক্সিতে উঠে হাত নেড়ে বললেন, "আবার যখন আসব, তখন তোদের মোচার ঘণ্ট করে খাইয়ে যাব। বাঙালির এমন সুন্দর খাওয়া-দাওয়া ভুলে গেলে চলে!"

বুমবাইর কেন জানি মনে হলো, জেঠু নিজেই বোধ হয় সেই জাদুকর। জেঠু যখন এত পারেন, তখন তাঁকে ঠিক একটা পালকের টুপিও দিতে পারেন। আবার এলে পালকের টুপিটা জেঠুর কাছ থেকে চেয়ে নিতে হবে।

॥ চার ॥

বুমবাই কাল রাত থেকে মহাখাপ্পা। এবারেও রাঙাজেঠুর বাড়ি যাওয়া হবে না। মা'র শরীর খারাপ। কাল রাতেই বাবা খাবার টেবিলে বলেছিল,—তা হলে রাঙাদাকে লিখে দি, যাচ্ছি না। তোমার বৌমার শরীর খারাপ। আশায় থাকবে, বুমবাইকে নিয়ে আমরা যাচ্ছি। কত করে বলে যায়, তোরা যাস। শহরের খাবার-দাবারে ভেজাল, বাতাসে অক্সিজেন কম, কলকারখানায় ধোঁয়া। গেলে বুমবাইয়ের শরীরটা ভাল হবে। গাঁয়ের খাঁটি দুধ, মাছ খেলেই বুঝবে স্বাদ আলাদা।

বুমবাই খাওয়ার পাত থেকে তড়াং করে লাফিয়ে উঠে গেছিল, —তোমরা না যাও, আমি একা যাব।

বোনটা হাত ধরে টেনে না আনলে সে আর হয়তো খেতই না। রাঙ্গাজেঠুকে মা দেখতে পারে না। এক কথা—তাঁর কি, ছেলেরা কৃতী, একা মানুষ, নিজের মর্জি ছাড়া কিছু বোঝে না।

না হলে কলকাতার অত বড় বাড়ি ফেলে বাপ-জ্যাঠার ভিটে-মাটিতে গিয়ে কেউ পড়ে থাকে! সেখানে জমিজমা কিনে, পুকুর কাটিয়ে তিনি এখন লাট। এসেই খালি—এই নাও বৌমা, আমার বাবার লাগানো এটা বড় সিঁদুরে গাছের, ঘণ্টাখানেক জলে ভিজিয়ে রেখে কাটবে। এই ন্যাসপাতি, চার-পাঁচটা নারকেল নিয়ে এলাম, ছেলেমেয়েকে নাড়ু বানিয়ে দেবে। থোড় এনেছি, কি করে রাঁধতে হয় শিখিয়ে দিয়ে যাব। সকালে উঠেই পাঁউরুটি, ডিম, ভেজাল মাখন। ও কী মাখন! যত সব চর্বি, কি করে যে হাতে ধরে দাও বুঝি না! কেন, দুধ রাখবে। বেশি করে সকালে দুধ কলা মুড়ি, দই পেতে রাখবে, দুপুরে খাবার পাতে টক দই খেলে শরীর ঠাণ্ডা থাকে। দেখতে হবে কার রক্ত গায়ে। ওদের বাবা-ঠাকুরদারা কবে সঁকালে উঠে একটা করে আস্ত সেদ্ধ ডিম খেয়েছে। গরমের দেশ—আমাদের বাপ-ঠাকুরদারা জানতেন, কখন কি খেতে হয়। আমরা তো ফেনা-ভাত খেতাম, মাছভাজা, সামান্য গাওয়া ঘি। দুপুরে তিতো দিয়ে শুক্তোনি। হয় উচ্ছে, নয় পলতা পাতা দিয়ে। ডাল, তরকারি, মাছের হালকা ঝোল—শেষ পাতে টক দই। এ সব খাওয়া সহ্য হবে কেন! বারো মাস অসুখ—কী চেহারা হয়েছে এক একটার!

মা তখন রান্নাঘরে গজগজ শুরু করছে,—এই আরম্ভ হলো! জেঠু বসার ঘরে—সেখান থেকেই সব কথাবার্তা।

জেঠু এলে, বসার ঘরেই থাকেন! শয়ন করেন। ভিতরে ঢুকলে, গলা খাঁকারি। একটা ক্যাম্পখাট পেতে, যে ক'দিন থাকেন তাঁকে নিয়ে হাজার রকমের গল্পে মেতে থাকেন। সেবারে কি সুন্দর একটা গল্প বলে গেছেন!

জেঠু নাবিক ছিলেন। জাহাজে পৃথিবীর সব দেশ ঘুরেছেন—কোথায় সেই একটি শহর, শহরের গায়ে পাহাড়, পাহাড়ের মাথায় বরফ জমে থাকে। সুন্দর সুন্দর সব লাল নীল কাঠের বাড়ি। পাইনের বন, আপেলের বাগান। সেখানে ম্যাগেলা বলে বুমবাইয়ের বয়সী একটা মেয়ের সঙ্গে জেঠুর ছবি আছে। ছবিটাতে ম্যাগেলা, জাদুকর বসন্তনিবাস আর রাঙ্গাজেঠু। রাঙ্গাজেঠু ছবিটা গেলবারে দেখিয়ে নিয়ে গেছে। জেঠুর বয়স তখন আর কত! টাই-কোট-প্যাণ্ট পরা সাহেব। কি সুন্দর দেখতে!

সে ছবিটা মাকে নিয়ে দেখিয়েছিল,—জানো, এই হলো জেঠু। আর পাশে আলখেল্লা পরে যে লোকটা দাঁড়িয়ে আছে, মাথায় তালপাতার টুপি। এ হলো জাদুকর বসন্তনিবাস। আর মাঝখানে সাদা ফ্রক গায়ে ছোট্ট মেয়েটা পরীর মতো দেখতে, ওর নাম ম্যাগেলা। জানো, জেঠু বলেছে, ম্যাগেলার বাবা জাহাজডুবিতে নিখোঁজ। ওর মা সারাদিন নাকি জানলায় দাঁড়িয়ে থাকত। সমুদ্রে সাদা জাহাজ ভেসে এলেই, ম্যাগেলাকে দেখে আসতে বলত, জাহাজে ওর বাবা ফিরে এল কিনা!

মা বলেছিল,—ফিরে এসেছিল?

বুমবাই একলাফে বসার ঘরে ঢুকে জেঠুর গায়ে মুখ লুকিয়ে বলেছিল,—ম্যাগেলার বাবা ফিরে এসেছিল?

জেঠু বুমবাইয়ের মাথার চুলে হাত বুলোতে বুলোতে বলেছিলেন,—আসেনি। কত বছর পার হয়ে গেছে, কোথায় জাহাজডুবিতে যে হারিয়ে গেল মানুষটা! তবে আমাদের মৈত্রদা, মৈত্রদা মানে জাদুকর বসন্তনিবাস, ওকে একটা পালক দিয়ে এসেছিল আর একটা রুপোলি ঘণ্টা।

পালক কেন জেঠু?

ঐ যে পালকের টুপিটা পরলেই ম্যাগেলা উড়তে পারবে। যেখানে খুশি চলে যেতে পারবে! সমুদ্র পার হয়ে কোন দ্বীপে, অথবা আফ্রিকার উপকূলে অনেক বনজঙ্গল আছে, ইচ্ছে করলে সেখানেও চলে যেতে পারবে। গভীর অরণ্যে বাঘ, সিংহ, গেরিলা,

সব সে দেখতে পাবে ; কিন্তু তাকে কেউ দেখতে পাবে না। এমন একটা পালক না হলে সে বাবাকে খুঁজতে যাবে কী করে? খুশিমতো উড়তে পারবে, বাতাসে ভেসে যেতে পারবে—কি মজা না?

রুপোলি ঘণ্টা কেন জেঠু?

ও, তাও জানিস না। জানবি কী করে! আমার তো বলাই হয়নি। ম্যাণ্ডেলার বাবা ম্যাণ্ডেলাকে, সেই অস্ট্রেলিয়া বলে একটা দেশ আছে না—

বুমবাই গম্ভীর চালে বলে,—আমি জানি। সেবারে গ্রেগ চ্যাপেল, লিলি, ইয়ান চ্যাপেল, সব খেলতে এল না!

ও, তা'লে তো কথাই নেই। তুই সবই জানিস দেখছি। ম্যাণ্ডেলার বাবা সেখান থেকে ওর জন্যে একটা ক্যাঙ্গারুর বাচ্চা নিয়ে এসেছিল। বাচ্চাটা ভারি শয়তান। কারো কথা শুনত না। কিন্তু ম্যাণ্ডেলা ধমক দিলেই লেজ গুটিয়ে পায়ের কাছে কুঁই কুঁই করত। ওদের বাড়ির সামনে একটা সিলভার ওক গাছ আছে, বুঝলি! ক্যাঙ্গারুটা ঐ গাছের নিচেই বাঁধা থাকত।

বুঝলি বুমবাই, সমুদ্রে শুধু জল আর জল। দিন যায়, মাস যায়, জাহাজ চলে, কিন্তু সমুদ্র আর শেষ হয় না। মাঝে মাঝে ছোট ছোট দ্বীপ। দ্বীপে একটা ফণী মনসার গাছ। ভেবে ছাখ্, হাজার হাজার মাইল জুড়ে শুধু নীল জলরাশি—কেমন ভাবতে লাগে একটা দ্বীপে একটা মাত্র ফণী মনসার গাছ! আকাশের নিচে তার বেঁচে থাকার কি আগ্রহ! একা নিঃসঙ্গ, কোন ভয়ডর নেই। গাছের প্রাণ আছে জানিস, গাছ সব বুঝতে পারে। ম্যাণ্ডেলাকে বলতেই সে বলল, আমার বাবা নয় তো! কোন জাদুকর যদি তাকে ওখানে একটা গাছ বানিয়ে পুঁতে রাখে!

কিন্তু জেঠু, রুপোলি ঘণ্টাটা কেন ম্যাণ্ডেলাকে দিয়েছিলেন জাদুকর বসন্তনিবাস, সেটা তো বললে না?

বা রে, ক্যাঙ্গারুর বাচ্চাটা তো ম্যাণ্ডেলার সঙ্গী! ম্যাণ্ডেলা একা

যাবে কী করে! ওর ভয় করবে না! তাই মৈত্রদা ওকে একটা রুপোলি ঘণ্টা দিয়েছিল। কী বলেছিল জানিস?

কী বলছিল জেঠু?—বুমবাই জেঠুকে জড়িয়ে শুনতে শুনতে সেই অজানা রহস্যময় পৃথিবীতে চলে গেছিল।

বসন্তনিবাস বলেছিল, ঘণ্টাটা তোমার সঙ্গীর গলায় পরিয়ে দেবে। তখন দেখবে সেও উড়তে পারছে তোমার সঙ্গে। দু'জন পাশাপাশি উড়ে যেতে পারবে। কি মজা বল্।

অমনি বুমবাই দৌড়ে রান্নাঘরে গিয়ে বলেছিল,—জানো মা, ম্যাণ্ডেলার বাবা আর ফিরে আসেনি।

মা'র চোখ কেমন তখন জলে চিকচিক করছিল। বলেছিল, —আহা বেচারা!

জানো মা, ম্যাণ্ডেলাকে না, ছবিতে যে জাদুকর দেখলে, একটা পালক আর রুপোলি ঘণ্টা দিয়েছিল।

ও দিয়ে কী হবে?

ম্যাণ্ডেলা উড়ে যেতে পারবে। বাতাসে ভেসে যদ্দূর খুশি চলে যেতে পারবে। কেউ দেখতে পাবে না। ক্যাঙ্গারুর বাচ্চাটা পাশে পাশে ভেসে যাবে। কেউ দেখতে পাবে না। কেবল সবাই শুনতে পাবে নীল আকাশে দমকলের ঘণ্টা বাজিয়ে কারা যায়। তারা তো জানে না, ম্যাণ্ডেলা যায়। ম্যাণ্ডেলা তার বাবাকে খুঁজতে যায়।

মা শুনে বলেছিল,—ধ্যুৎ! তা আবার হয় নাকি! তোর জেঠুর যত আজগুবি গল্প। কাজ নেই, কম্ম নেই, খাওয়া-পরার ভাবনা নেই, আজ এই আত্মীয়ের বাড়ি, কাল সেই আত্মীয়ের বাড়ি—বছরের বেশিটা সময় ঐ করে কাটান। কোন্‌দিন দেখবি, তোর জেঠু বলছে, তিনিই সেই জাদুকর। ইচ্ছা করলে তিনিও ছোটদের পালক দিতে পারেন, রুপোলি ঘণ্টা দিতে পারেন।

বুমবাইয়ের সত্যি কেন জানি সেই থেকে মনে হতো জেঠু সত্যি পারে। সে তার ক্লাসের বন্ধুদের বলেছে,—জেঠু নাবিক ছিল জানিস। ম্যাণ্ডেলার গল্পও করেছে। জেঠু চলে যাওয়ার পর সে

কতদিন সবাই ঘুমিয়ে পড়লে জানলা খুলে আকাশের দিকে চেয়ে থাকত। যদি রুপোলি ঘণ্টার শব্দ শুনতে পায়। জেঠু বলেছে, বড়রা শুনতে পায় না, কেবল সে ঘণ্টার শব্দ ছোটরাই শুনতে পায়। সে ভেবেছিল, এবারে গেলে জেঠুকে ধরবে, জেঠু, তুমিই সেই জাদুকর। তুমিই পার পালক আর রুপোলি ঘণ্টা দিতে। কিন্তু তার তো ক্যাঙ্গারুর বাচ্চা নেই। সে এজন্যে বাবাকে বলে সাদা ধবধবে ছোট্ট একটা কুকুর নিয়ে এসেছে। সে নামও দিয়েছে—রাজা। রাজাকে নিয়ে সে তবে খুশিমতো আকাশের নিচে বাতাসে ভেসে চলে যেতে পারবে। ওঃ, কি মজা!

সব মাটি! কাল থেকেই মা বিগড়েছে। বলেছে,—না বাপু, যেতে হয় তোমরা যাও। আমি যাব না। স্টেশন থেকে দু'ক্রোশ পথ রিক্সায়। হেঁটে আবার কতটা যেতে হবে। রাস্তা নেই, আলো নেই। অন্ধকারে আমি ভয়েই মরে যাব।

বুমবাই বলেছে, বা রে, লণ্ঠনের আলো আছে না! অন্ধকার হবে কেন! জেঠু রাতের বেলা লণ্ঠন জ্বেলে গাছের নিচে ইজিচেয়ারে বসে থাকে।

নাঃ! তবুও না, কিছুতেই রাজি না।

রাতে সে ঘুমোতে পারেনি। ক্লাস সেভনে উঠেছে বলে সে আলাদা বিছানায়, আলাদা ঘরে বোনকে নিয়ে শোয়। সারারাত তার ঘুম হয়নি। সকালে উঠে সে দাঁত মাজেনি। আজ ঠিক করেছে, কিছু খাবে না। গরমের ছুটিতেই যাবার কথা। জেঠু লিখেছিলেন, বাবাকে, তোরা চিঠি দিলে আমি ইস্টিশনে থাকব। বাড়ি আসতে আমার অসুবিধা হবে না। বৌমাকে বলবি, এই বনজঙ্গলের আলাদা সৌন্দর্য আছে। এত বড় আকাশ তোরা শহরে কোথায় পাবি! সামনে দিগন্তপ্রসারী শুধু ধানের ক্ষেত। সব সবুজ। কত রকমের ফড়িং উড়ে বেড়ায়—বুমবাই অন্য এক পৃথিবীর বাসিন্দা হয়ে যাবে কিছুদিনের জন্য।

সকালে বাবা ডেকে বললেন,—দাঁত মাজছ না কেন বুমবাই?

না মাজব না। আজ আমি কিছু খাব না।

বাবা ওর ব্যথাটা বুঝতে পেরেছেন। বলেছেন,—ঠিক আছে, আমি একবার তোমাকে নিয়ে জেঠুর বাড়ি ঘুরে আসব।

রান্নাঘর থেকে মায়ের গলা,—হ্যাঁ, তাই যাও। যা দুরন্ত তোমার ছেলে, পোকামাকড়ে কামড়ালে, আমি কিছু জানি না। আমার হয়েছে মরণ। কই, কলকাতার এত বড় বাড়ি দারোয়ানের জিম্মায় আছে, বলতে তো পারেন, ওখানে গিয়ে কিছুদিন থাক। বলেছে কখনও !

বাবা বললেন,—ঠিক আছে। আবার রাঙ্গাদা এলে বলব।

বুমবাই বলল,—না, আমি ও বাড়িতে যাবই না। মামাবাড়ি তো সেখানেই। আমার একদম ভাল্লাগে না।

মা বের হয়ে এসে বলল, তা ভাল লাগবে কেন ! সেখানে তো ছোটাছুটি চলে না, দস্যিপানা করতে দেয় না দাদারা। কান মলে দেয় দুষ্টুমি করলে।

বুমবাইকে কিছুতেই খাওয়ানো গেল না। সে তার ঘরে শুয়ে রইল। মা বলেছে,—খাবে না, খাবে না। অত সাধাসাধি কিসের ! খিদে পেলে আপনিই খাবে। তোমার অফিসের দেরি হয়ে যাচ্ছে !

বোনটা এসে বলল,—আয় না দাদা, খাবি।

না। যা আমার কাছ থেকে। জেঠু গেলে কত খুশি হতো !

বোনকে তখন মা শাসন করছে, এদিকে চলে আয়। জেঠুর পাল্লায় পড়ে গোল্লায় যাচ্ছে ! এ কী রে বাবা, যত আজগুবি সব গল্প বলে হাওয়া। আমার হয়েছে মরণ। তেনার পালকের টুপি চাই। রুপোলি ঘণ্টা চাই। জেঠুর কাছ থেকে তিনি চেয়ে নেবেন। তিনি হাওয়ায় উড়বেন। মাথাটা খাচ্ছে একেবারে।

বুমবাইয়ের বড় অভিমান হয়। জেঠু কত আশা নিয়ে বসে আছে, তারা যাবে। বাবা জেঠুকে চিঠি দিয়েছিল, বুমবাইয়ের গরমের

ছুটি হলে তোমার বৌমাকে নিয়ে যাব! বুমবাই যাবার জন্য পাগল হয়ে আছে। সবাইকে বলেছে,—আমরা গরমের ছুটিতে এবার জেঠুর বাড়ি যাব।

ভাবতেই বুমবাইয়ের কেমন কান্না পায়। জেঠুকে মনে হয়, পৃথিবীতে বড় একা। তাঁর এত থেকেও কিছু নেই। কিসের যেন অভাব, যা তিনি খুঁজে বেড়ান। না হলে দু'তিনজন চাকর-বাকর নিয়ে এমন একটা জঙ্গলের মধ্যে একা কেন থাকবেন? কাঠবেড়ালীরা তাঁর সঙ্গী। পাখিরা তার সঙ্গী। গাছেরা তাঁর সঙ্গী, সবাই তাঁকে ছেড়ে চলে গেছে।

জেঠু বুঝতে পেরেছেন, এরা কখনও তাঁকে ছেড়ে যাবে না। বড় একটা কাঠের বাক্সে নাকি জেঠুর কত বয়সের সব ছবি, সব তিনি বড় যত্ন করে রেখে দিয়েছেন। কেউ গেলেই ছবিগুলি দেখান।

জেঠিমা নাকি প্রতিমার মতো দেখতে ছিলেন! ছেলেরা কত বড় বড় কাজ করে—কোথায় কোন্ মুল্লুকে তারা সব থাকে। তার মনে হয়, জেঠুর এখন গাছপালা ছাড়া আর কোন সম্বল নেই। জেঠু হয়তো রোজ তাদের আশায় লণ্ঠন নিয়ে ইস্টিশনে এসে বসে থাকেন। ট্রেনটা চলে গেলে একা একা বাড়ি ফেরেন।

বুমবাই পরিষ্কার দেখতে পায়, মাঠ পার হয়ে সত্যি জেঠু চলে যাচ্ছে। হাতে লণ্ঠন। গাছপালার ছায়ায় একজন বড় মাপের মানুষ মাটির রাস্তায় গভীর রাতে অন্ধকারে পথ হাঁটছেন।

জেঠুর কথা ভাবতে ভাবতে চোখে জল ভরে এল বুমবাইয়ের। বুকের মধ্যে ভীষণ যন্ত্রণা। সে পাশ ফিরে শুয়ে বিড়বিড় করে উঠল,—আমি বড় হলে তোমার কাছে চলে যাব। তোমার সঙ্গে থাকব। কেউ আমাকে আটকে রাখতে পারবে না। জেঠু জানো, তোমাকে কেউ ভালবাসে না। তুমি কিন্তু বাসো—গাছপালা, পাখি, মানুষ সব্বাইকে, আমিও বাসব।

॥ পাঁচ ॥

বুমবাইয়ের কিছু ভাল লাগছিল না। সে একটা পার্কের বেঞ্চিতে বসে আছে। কিছুক্ষণ ক্ষোভে অভিমানে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছে। এখন আর তার কাঁদতেও ইচ্ছে হচ্ছে না।

চারপাশে বড় বড় শাল গাছ। কত বড় আর ডালপালা মেলে আকাশ ছুঁয়ে দিতে চাইছে। তার মনে হলো, সে যদি এখন একটা শালগাছ হয়ে যায় কেমন হয়। মা, ঝুপি দু'জনেই জব্দ। বুঝতেই পারবে না তার দাদাটা একটা শাল গাছ হয়ে গেছে। গাছের নিচ দিয়ে হেঁটে গেলেও বুঝতে পারবে না—এ তার দাদা হয়। ঠাকুর দেবতার কাছে বর চাইলে কত কিছু পাওয়া যায়। সে যদি একটা শাল গাছ হতে চায় ঠিক বলবেন, আচ্ছা তাই। সে বেঁচে থেকে দেখতে পাবে, হাউমাউ করে কাঁদছে ঝুপি। 'দাদারে' বলে ডাকছে। সে কিছুতেই রা করবে না। বলবে না, তুই আমার সব কেড়ে নিস। এখন বোঝ। শাল গাছ হয়ে গেছি। আর নিবি?

নেব না।

তিন সত্যি?

তিন সত্যি।

মা কালীর দিব্যি?

মা কালীর দিব্যি।

সে খুব অবাক হয়ে ভাবছে এখনও তাকে কেউ কেন খুঁজতে এল না। সে তো তাড়া খেয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে এখানে এসে বসে আছে। মা-টা যে কেমন! ঝুপিকে কিছু বলবে না। সে বসে বসে একটা সুন্দর ছবি আঁকছিল। একটা পার্ক। দুটো বেঞ্চি। দুই বেঞ্চিতে দুই বুড়ো লাঠি বগলে নিয়ে আকাশের তারা গুনছে! ছবিটা সে এমনই আঁকতে চেয়েছিল। ছবি আঁকা নিয়ে মা'র সঙ্গে তার বনিবনা হয় না। মা সবসময় বলবে,

এখন তোমার ছবি আঁকার সময়! অঙ্কগুলো করেছ! কই দেখি কী করলে!

মা রান্নাঘর থেকে বলছিল, এই ঝুপি, দেখ তো তোর দাদা কী করছে!

ঝুপিটা সবসময় মা'র চর হয়ে কাজ করে। সে ছবি আঁকছে দেখতে পেলেই বলবে, মা, জানো, দাদা না ছবি আঁকছে।

ছবি আঁকছে! এখন ছবি আঁকার সময়।

ঝুপি ছুটে এসে টেবিলে ঝুঁকে খাতাটা তুলে নিয়ে দৌড়। কার সহ্য হয়। ছবিটা আঁকা শেষ। বুড়ো মানুষ দুটোর বগলে দুটো লাঠি এঁকে দেওয়া বাকি। ওটা হয়ে গেলেই সে তার ছবিটা শেষ করতে পারত। ক্লাসের বন্ধুরা ওর ছবির খাতা বাড়ি নিয়ে যায়। মা-বাবাকে দেখায়। শুধু মা তার ছবি আঁকা পছন্দ করে না। তবে বাবা চায়, বুমবাই ছবি আঁকুক। মা যখন মাঝে মাঝে খুব খুশি থাকে —কেউ এলে তার ছবি আঁকার খাতা খুলে দেখায় পর্যন্ত। কিন্তু পড়ার সময় ছবি আঁকলে মা'র বড় রাগ হয়।

আচ্ছা, সবসময় কারো পড়তে ভাল লাগে! মা না কিছু বোঝে না। মা'র আস্কারা পেলে ঝুপিটা আরও কেমন ক্ষেপে যায়। সে ছুটে এসে খাতাটা না নিয়ে গেলে ঝুপিকে মারতই না। কার না রাগ হয়। ছবিটা ছিঁড়ে গেল। ঝুপির চুল ধরে সে সত্যি ওর পিঠে দু'ঘা মেরেছে। সঙ্গে সঙ্গে ঝুপি কেমন পিঠ বাঁকিয়ে খাতা-ফাতা সব ফেলে কাঁদতে আরম্ভ করল। যেন ওর নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। ঝুপির কান্না শোনামাত্র মা কী বুঝতে পারে কে জানে, খুন্তি হাতে তেড়ে এসেছিল। সে বুঝেছিল, এখন না পালালে, তার পিঠে মা খুন্তিখানা ভাঙবে। এবং সঙ্গে সঙ্গে দৌড়।

মা'র চিৎকার—কোথায় যাবে! আসুক তোমার বাবা! আজ দেখাচ্ছি। কে তোমাকে খেতে দেয় দেখব।

সে রাস্তায় এসে গেছে। বলে, মা অতদূরে ছুটে আসতে পারে না। রাস্তার দু'পাশে সব সুন্দর সাজানো গোছানো ঘরবাড়ি। এই পাকা

রাস্তাটা কতদূর কোথায় চলে গেছে সে জানে! সে, বাবা-মা স্কুটারে চড়ে শহরটা কতবার যে ঘুরেছে! কিন্তু এতদূর একা সে কখনও আসেনি। স্কুল ছুটি। রাস্তায় নেমে তার অভিমান এত বেড়ে গেল যে মনে হলো, সে কোথাও চলে যবে। আর কোথাও না হোক, রাঙ্গাজেঠুর বাড়ি। সেটা কতদূর কোথায় সে জানে না।

বছরে একবার রাঙ্গাজেঠু এলে সব ছবি তাকে দেখান চাই—এই এক অপার আনন্দে সে সারা বছর ছবি এঁকে রাখে। এসেই বলবে, দেখি তোমার ছবির খাতা!

আর তার ছবি দেখে মজা পায় মৃদুলকাকা। বাবার সঙ্গে একই অফিসে কাজ করে। ঢুকেই কাকা ছড়া কাটবে—

উপদেশ শুনে নাও মৃদুলকাকুর,
ছবি এঁকে বিখ্যাত অবন ঠাকুর।
সুতরাং বাদ দাও ভূগোল জ্যামিতি,
ছবি এঁকে চুরমার করে দাও রীতি।

আর তক্ষুণি মা রান্নাঘর থেকে বের হয়ে বলবে, আর আগুনে ঘি ঢেল না। এমনিতেই পড়তে চায় না। তার ওপর তুমি আবার তাতাচ্ছ।

মৃদুলকাকা তখন মাকে আরও ক্ষেপিয়ে দেবার জন্য বুমবাইকে কাছে বসিয়ে ছবি দেখতে দেখতে বলবে—গ্র্যাণ্ড। অসাধারণ। বৌদি, চা।

চা হবে না। ছবি নিয়ে কাকা-ভাইপোতে থাক।

এক কাপ। ওনলি ওয়ান কাপ।

আর সঙ্গে সঙ্গে মা বসার ঘরে ঢুকে বলবে, তোমরা সবাই মিলে ওর মাথাটা খেলে!

মৃদুলকাকার চোখে তখন যেন অপার বিস্ময়—সবাই মানে! আমি তো জানতাম, আমি একাই ওর মাথাটা খাচ্ছি—সঙ্গে সঙ্গে ছড়া—

বুমবাই ছবি আঁকে ঘরে ঢুকে ঝুপি,
দেখে নিয়ে মাকে গিয়ে বলে চুপিচুপি।

মা কেমন মৃদুলকাকার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে তখন। মুখে মুখে ছড়া। ছন্নছাড়া মানুষ না হলে হয় না। বিয়ে-থা করল না। মা'র খুব আক্ষেপ, বলে, এখন না হয় মাসিমা আছে, পরে কে দেখবে!

কেন সবাই। সবাই দেখবে। বুমবাই দেখবে।

তারপর ঝুপির দিকে তাকিয়ে বলবে, কি রে ঝুপি, বুড়ো হলে দেখবি না?

ঝুপি সবসময় মা'র পথ নেয়। সে মুখ বাঁকিয়ে বলবে—না দেখব না। তুমি আমাকে নিয়ে ছড়া কাট কেন?

আর তখনই মৃদুলকাকার হাহাকার হাসি। তারপর চা এলে বলবে, দ্বিতীয় ব্যক্তিটি কে?

আর কে? ওর রাঙ্গাজেঠু।

ওহো। দাদা মাঝে মাঝে বলেন। সেই মুক্ত মানুষ—আমারও জানো অমন হতে ইচ্ছে হয়। শুধু সারা দেশ আর আত্মীয়ের বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়ানো। বড় বড় কই মাছ ভাজা—ওঃ, ভাবা যায় না।

তাহলে দাদা তোমায় সব বলেছে।

বলবে না! দাদা তো তার সুখ-দুঃখের কথা অফিসে না বলতে পারলে স্বস্তি পায় না।

মা'র তখন এক কথা—আচ্ছা তোমরাই বলো, ঠিক অ্যানুয়েল পরীক্ষার আগে এসে উদয় হবেন। তখন তাঁর ইচ্ছে হয় ভাইপো-ভাইঝিদের ভালমন্দ খাওয়াবার। আমরা নাকি সব ছাইপাশ খাওয়াই! একি বৌমা, সকালে এই খাবার। মাখন, পাঁউরুটি, ডিম, কলা! এটা কি বাঙালীর খাদ্য! সকালে ফেনা ভাত, এক গণ্ডুষ ঘি আর মাছভাজা। সারাদিন এই চলবে। আর বুমবাইয়ের তখন যেন চার হাত-পা গজিয়ে যায়। জেঠুকে সব ছবি দেখাবে, জেঠুর সঙ্গে বেড়াতে বের হবে। মানুষটার যদি একরত্তি আক্কেল থাকে! কার না রাগ হয়। এই তো গত বছরে ভাইপো-ভাইঝিদের

কই মাছ খাওয়াবেন বলে এক হাঁড়ি—বিশ্বাস করবে না, এত্ত বড় বড়। কে কাটে, কে করে! যদি একটু বুঝত।

মৃদুলকাকা শুনে হেসেছিল।—পারফেকট ম্যান!

—তার মানে?

—মানে পারফেকট ম্যান।

মা বলেছিল, অমন পারফেকসানের দরকার নেই। আসলে ভাইপো-ভাইঝির মাথাটা চিবিয়ে খাবার ব্যবস্থা। আমি আর সহ্য করব না।

—তোমার হাতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধতে হয়েছিল বলে!

মা এতে আরও ক্ষেপে যায়।—তার মানে তোমার দাদাটি তবে অফিসে সব বলেছে?

—হ্যাঁ, বলল তো, কী বিড়ম্বনা, দাদা এত বড় বড় কইমাছ নিয়ে হাজির। বুমবাইয়ের মা তো কইমাছ কাটতে জানে না। ভাসুর ঠাকুরের কানে উঠবে কথাটা, এই ভেবে নিজেই কইমাছ ধরতে গিয়ে হাত ফালা ফালা। রক্তপাত, ডেটল, তুলো, ব্যাণ্ডেজ।

মা মুখ গোমড়া করে চলে গেছিল। এসব কথাও বাবা অফিসে গিয়ে বলে! সেদিন বাবা অফিস থেকে আসার পর, মা'র একটা কথা না। সহসা দুজনে আড়ি হয়ে গেল। বাবা-মা'র মধ্যে আড়ি হলে সে মজা পায়। তখন দুজনেরই সম্বল সে।—দেখ তো বুমবাই, গরম জলো হল কিনা! দেখ তো বুমবাই রান্নার কতদূর।

মা বলবে, তোমার বাবাকে বাথরুমে যেতে বল। জল দেওয়া হয়েছে।

দুজনের সব কথাবার্তা ভায়া বুমবাই। সংসারে তখন যে তার বড় গুরুত্ব আছে টের পায়।

সেই মা-বাবাকে ছেড়ে কতদূর কোথায় চলে এসেছে? বেঞ্চিতে অনেকক্ষণ শুয়ে থাকল। বড় রাস্তায় বাস যাচ্ছে। বাসগুলি বর্ধমান-কলকাতা যায়। এরই একটা বাসে চাপলে বোধহয় কলকাতায় চলে যাওয়া যায়। সেখান থেকে শিয়ালদহ যেতে হয়। ট্রেনে জেঠুর

বাড়ি যেতে হয়। বাবা একবার বলেছিল, দেখি সময় পেলে সবাইকে নিয়ে একবার ঘুরে আসব। জেঠু একা মানুষ। দুই ছেলে বিদেশে। অনেক জমি, আমবাগান, লিচুবাগান, গরুর দুধ অঢেল। একা থাকেন। আর বাড়ি থাকলে শুধু গাছপালার সেবাযত্ন করেন। জেঠু বলেছেন, গেলে দেখতে পাবি আমার বাড়ির গাছপালায় কতরকমের পাখি উড়ে আসে, রঙ-বেরঙের প্রজাপতি, কত ফড়িং আর কীটপতঙ্গ। মানুষের আবাসে সব কিছুরই বড় দরকার। তুই ইচ্ছে করলে গাছতলায় বসে সারাদিন ছবি আঁকতে পারবি। বড় মাঠ সামনে। শস্যক্ষেত্র সামনে। চাষীরা ধান রুইছে, ধান কাটছে, আবার জমি একেবারে উরাট। শস্যকণা খুঁটে খাবার লোভে অজস্র কাক শালিকের ভিড়।

বুমবাইয়ের কাছে রাঙ্গাজেঠুর বাড়ি এক যেন রূপকথার জগৎ। সেখানেই সে চলে যাবে। কিন্তু এতদূর একা এসে সে কেমন ভয় পাচ্ছে। কেউ যদি তাকে ধরে নিয়ে চলে যায়! তার কান্না পাচ্ছিল।

তার বাড়ি যেতেও ইচ্ছে হচ্ছে না। ঝুপিকে মা বেশি ভালবাসে। তাকে মা ভালবাসে না। ঝুপিকে সে কি এমনি এমনি মারে! তুই আমার ছোট বোন। আমি তোর বড় না! আমার কথা শুনতে হয় না! কথা না শুনলে কার না রাগ হয়! আর মা'র কাছে সব লাগান! কে সহ্য করে! অসহ্য হলেই তো মারি। তুই তো খামচে দিয়েছিস কত জায়গায়। কিন্তু মা'র এক কথা। তোমার ছোট বোন না! এভাবে মারতে আছে? ইস, মেয়েটা শ্বাস নিতে পারছে না! কি দস্যি ছেলে!

ঠিক আছে, সব আমার দোষ। জেঠুর বাড়ি চলে যাব! বাড়ি আর ফিরব না। বাড়ি গেলে ঢুকতে দেবে না যখন বলেছ আর যাচ্ছি না। বলে, উদাস চোখে বড় শালগাছটার দিকে তাকিয়ে থাকল। যেন শালগাছ হয়ে বেঁচে থাকা অনেক ভাল। অন্তত আর যাই হোক, ঝুপি তার পেছনে লাগতে পারবে না। আমার অমন সুন্দর ছবিটা ছিঁড়ে ফেলল ঝুপি—মা কিছু বলল না! মৃদুলকাকা কত খুশি হতো দেখলে, জেঠু কত খুশি হতো! তুই এত নিষ্ঠুর ঝুপি!

আর তখনই শুনতে পেল কে যেন ডাকে।

সে কান খাড়া করে রাখল।

আবার ডাকটা স্কুলের মাঠ পার হয়ে চলে আসছে।

কে ডাকে?

সে বেঞ্চি থেকে উঠে বসল।

কেউ ডাকে। সে উঠে দাঁড়াল।

তখনই শুনতে পেল, ঝুপি ডাকছে, দাদা……রে।

বুমবাইয়ের সব রাগ জল হয়ে গেল। সব অভিমান উবে গেল। ঝুপি তার দাদাকে খুঁজতে বের হয়েছে।

—দা…দা…রে। বাড়ি আয়। আমি খাইনি। মা খায়নি। দা…দা · রে।

বুমবাইয়ের মনে হলো, এবার থেকে সে সব সুন্দর ছবি এঁকে দেবে ঝুপিকে। বলবে, ছবিগুলো তোর। ইচ্ছে হয় ছিঁড়ে ফেলবি, ইচ্ছে হয় রাখবি।

তবে বুমবাই জানে, ঝুপিকে একটা ছবি এঁকে দিলে আর কোনাদিন ছবি নিয়ে টানাটানি করবে না। এতদিন এত ছবি এঁকেছে, এ পর্যন্ত একটা ছবিও সে ঝুপিকে দেয়নি। আজই বাড়ি ফিরে ঝুপির জন্য ছবি আঁকতে বসবে। বলবে, এটা তোর জন্য আঁকছি। তাহলেই ঝুপি ঠিক তার ছবির মর্ম বুঝবে। কাউকে কিছু না দিলে রাগ হবারই তো কথা।

আবার ডাকছে ঝুপি—দা…দা…রে।

এই ডাক কত আপন সে বুঝতে পারে। সে বলতে পারছে না, আমি এখানে রাগ করে বসে আছি। সে দৌড়েও যেতে পারছে না। ঝুপিকে সে সত্যি আজ খুব জোরে মেরেছে। ঝুপির জন্য তার কান্না পাচ্ছিল।

আর তখনই ঝুপি তাকে দেখতে পেল। বেঞ্চিতে দাদা বসে। এক দৌড়ে দাদার কাছে এসে জামা খামচে ধরল। ধরে মা-কে ডাকতে থাকল, মা, শিগগির এস। দাদাকে ধরে রেখেছি। শিগগির।

ঝুপির ধারণা দাদা আবার যদি দৌড় দেয়। সে সাপটে দাদাকে ধরে রেখেছে।

ঝুপি সাপটে দাদাকে ধরে রেখেছে

আর তখনই দেখল, দাদার চোখে জল। দাদার চোখে জল দেখলে সেও নিজেকে সামলাতে পারে না। সেও কেঁদে ফেলল।

॥ ছয় ॥

বুমবাইর বাবা আজ অফিস ছুটি না হতেই বাড়ি চলে এল। এখন শীতের দিন বলে ছুটির সময় সাঁজবেলায়। বাবা সাঁজ না লাগতেই চলে এল। মুখ গম্ভীর। বুমবাই বাবাকে এত গম্ভীর কখনও দেখেনি। সে আজ খেলতেও যায়নি। ঝুপির জন্য পর পর তিনটে ছবি এঁকে দিয়েছে। শেষ ছবিটা, রাঙ্গাজেঠু লাল জঙ্গলের ভিতর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন। সে আর ঝুপি সঙ্গে। রাঙ্গাজেঠু বের হয়েছে তাদের নিয়ে পাখি চেনাবে বলে। আসলে সেবারে এসে বাবাকে বলেছিল, তোদের এত করে বললাম, বুমবাইকে বৌমাকে নিয়ে একবার ঘুরে আসবি, তোদের এখানটায় তেমন পাখি নেই, গাছপালা নেই—শৌখিন গাছপালা, জীবনটাকেও শৌখিন করে ফেলেছিস, লিখলি গ্রীষ্মের ছুটিতে যাবি। পরে আবার কী যে মতিগতি হলো বুঝি না—লিখলি বৌমার শরীর ভাল নেই। রাঙ্গাজেঠুর চিঠি এলেই বুমবাই পড়ে। তাকেও তিনি আলাদা চিঠি দেন। চিঠির আলাদা ঘ্রাণ—সেবারে সব ঠিকঠাক; যাবে, হঠাৎ মা'র যে কী হলো, বলল, তোমরা ঘুরে এস, আমার অদ্দূর অজ পাড়াগাঁয়ে যেতে ভয় লাগে।

বুমবাইর কী রাগ! সে সবাইকে বলে রেখেছিল, সব বন্ধু-বান্ধবদের, এবারের ছুটিতে আমরা রাঙ্গাজেঠুর বাড়ি যাব।

কেউ বলেছে, আমরা যাচ্ছি শিলং।

কেউ বলেছে, আমরা যাচ্ছি পুরী।

কিন্তু বুমবাই বলেছে, এবারের ছুটিতে আমরা যাচ্ছি রাঙ্গাজেঠুর বাড়ি।

ঝুপির পুচকে সঙ্গীটি বলেছে, ও মা, বুমবাইদা যাবে রাঙ্গাজেঠুর বাড়ি। ওটা আবার বেড়ানো নাকি! হ্রদ আছে? গেস্ট-হাউস

আছে? সমুদ্র আছে? পাহাড় আছে ওখানে? তা না থাকলে বেড়ানোর কোন মানে হয় না।

—আলবৎ হয়। তুই জানিস না, রাঙ্গাজেঠুর বাড়িটাই একটা দেখার জায়গা। রাঙ্গাজেঠু বলেছে, সাঁজবেলায়, গাছতলায় বসে কখনও বই পডতে পড়তে যখন কিছু ভাল লাগে না, তখন দেখি নীল আকাশের নিচ দিয়ে কত পাখি নানুটি বিলের দিকে যাচ্ছে। তখন আবার বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করে।—কোথায় যায় পাখিরা? জেঠু বলেছে, যায়, পদ্মপাতায় বসে ঘুম যাবে বলে। পদ্মপাতা, বিলের জল, পাখির ছবি ভাবলেই মনে হয় সেও জেঠুর হাত ধরে বিলের পাড়ে দাঁড়িয়ে আছে। জেঠু বছরে, দু-বছরে এখানে এলেই সারাদিন ভারি মজার মজার গল্প। গেস্ট-হাউসে বসে সে-সব গল্প শুনলে তার কোন মানে থাকে না।

বাবা কিছু বলছেন না। চুপচাপ বাইরের ঘরে বসে আছেন। মা এসে বলল, কী ব্যাপার, অফিস থেকে অত তাড়াতাড়ি বের হয়ে এলে! তারপরই বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে কেমন চমকে গেল মা। কোন অশুভ খবর যদি থাকে, মা বলল, কী হয়েছে বলবে তো! এসেই বসে পড়লে, জামা প্যাণ্ট ছাড়লে না।

বুমবাই দেখল একখানা চিঠি বাবা মা'র দিকে এগিয়ে দিলেন। দিয়েই বললেন, কাল সকালেই যাব। আমার কিছু ভাল লাগছে না।

চিঠিটা পড়ে মা'র কোন ভাবান্তর দেখা গেল না। শুধু বলল, স্ট্রোক। তা তুমি গিয়ে কী করবে!

মা'র এই এক স্বভাব! স্ট্রোক কথাটা বুমবাই ভালই বোঝে। ঠিক বাবার দিকের কোন আত্মীয়ের স্ট্রোক—মা'র দিকের হলে এতক্ষণে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ত।

সে বলল, বাবা, কার স্ট্রোক?

—তোমার রাঙ্গাজেঠুর।

স্ট্রোক কথাটার সঙ্গে মৃত্যু এবং এক অভাবনীয় বিপদের যেন সে গন্ধ পেল। বলল, আমিও যাব।

—যাবে।

মা কেমন ক্ষেপে গেল। তুমি গিয়ে কী করবে! স্কুল কামাই হবে না!

বাবা কাতর গলায় বললেন, যেতে চাচ্ছে যখন, বাধা দিচ্ছ কেন। এমনিতে তো আর যাওয়া হলো না—বাবা কেমন দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

বুমবাই জানে, বাবা তার মামাবাড়িতে মানুষ। রাঙ্গাজেঠু বাবার চেয়ে কত আর বড় হবে। পাঁচ সাত বছরের। না, তাও যেন নয়। রাঙ্গাজেঠু কী লম্বা আর দেখতে ভারি সুন্দর। একা মানুষ। বড় হলে বোধহয় সবাই আলাদা গ্রহের মানুষ হয়ে যায়। বাবার মুখে জেঠুর দুই ছেলের গল্প শুনেছে। কখনও দেখেনি। জেঠুর বড় ছেলে মেম বিয়ে করেছে। সেই জর্জিয়া না কোথায় থাকে। ছোট ছেলে মধ্যপ্রদেশে থাকে। ডি. এম.। জেলার হর্তাকর্তা। জেঠু কলকাতার বিশাল বাড়ি ফেলে গাঁয়ে ফিরে গেছে —সেই কবে, অনেক জমিজমা, পুকুর, মাঠ নিয়ে বিশাল এলাকা জুড়ে তার বাবা-কাকাদের ঘড়বাড়ি।

জেঠিমাকে সে দেখেনি। জেঠুর মুখেও জেঠিমার কোন গল্প শোনেনি। কোন কারণে জেঠিমার কথা তুললে জেঠু কেমন বিষণ্ণ হয়ে যেতেন। এখন একেবারে একা। অবশ্য মহাদেব বলে তার একজন সঙ্গী আছে। সেই সব দেখাশোনা করে। বাড়িতে আট দশজন লোক সবসময় খাটছে। শ্যালো বসিয়ে চাষ-আবাদ, গোয়ালে আট দশটা জার্সি গাই। পোষা দুটো অ্যালসেসিয়ান, গোটা আটেক বিড়াল, একটা খোঁড়া বাঁদর, আর আছে অজস্র গাছপালা—জেঠুর বাড়িটা নাকি কাঠের। লাল নীল রঙের ছোট্ট বাড়ি। চারপাশে সব আম জাম নারকেল গাছ। দুটো সফেদা গাছ আছে। লিচুর বাগান, বাঁশঝাড় এ-সবের ভিতর থেকে জেঠুর বাড়িটা মিকিমাউসদের মতো দেখতে।

সকাল বেলাতেই বুমবাই বাবার সঙ্গে রওনা দিল। মা খুবই

অপ্রসন্ন, তবে এবারেই বুমবাই দেখল বাবা প্রথম যেন বিদ্রোহ করলেন। সে গজগজ করতেও শুনেছে—এত স্বার্থপর, আত্মকেন্দ্রিক হলে চলে। নিজের ছেলেমেয়ে স্বামী ছাড়া সংসারে আর কারো দাম নেই। মা'র মুখের উপর বাবা রেগে গিয়ে বলেছিলেন, বুমবাই যাবে।

মা কোন কথা বলেনি। বাবা নিজের মতো গোছগাছ করে, তার হাত ধরে বের হয়ে পড়েছিলেন। বলেছিলেন, তোর মা জানে না, রাঙ্গাজেঠু না থাকলে আমার কিছুই হতো না। রাঙ্গাজেঠুর বাবা-কাকারা না দেখলে, তোর মা'র এই ছিমছাম কোয়ার্টার্স, টি. ভি, ফ্রিজ কিছুই জুটত না। আমার মা তাঁর দাদাদের চিঠি লিখতেই খবর এল, ওকে আমাদের বাড়িতে পাঠিয়ে দাও। আমরা মামাতো পিসতুতো ভাইবোন মিলে পনের বিশজন, এক লপ্তে বসে খেতাম, পুকুরে সাঁতার কাটতাম, স্কুলে যেতাম—যেন একটা বাহিনী। সেই মামাবাড়ি তোকে দেখাতে পারলাম না। আমার কত কষ্ট, তোর মা বুঝবে কী করে! তোর মা তো জানে না, খেতে বসলে বড় মামী, মেজ মামী, ছোট মামী কে কার ছেলে কিছু দেখত না। মনেই হতো না, মামার বাড়ি। তোর মা পারবে বাড়তি একজনের হ্যাপা পোহাতে! দেখেছিস তো তোর রাঙ্গাজেঠু এলেই কেমন মুখ ভার করে রাখত। এমন একটা মারাত্মক খবর, আমলই দিল না। এখন গিয়ে কী দেখব কে জানে!

বুমবাইর বুকটা ধড়াস করে উঠল। বাসে ইস্টিশন। রেলে চড়ে ব্যাণ্ডেল। গাড়ি বদল করে খাগড়াঘাট স্টেশন। বাসে আবার নদী পার হতে হবে। আবার রিকশায় দু' ক্রোশের মতো পথ। তারপরই রাঙ্গাজেঠুর বাড়ি। সামনে আদিগন্ত মাঠ। যতদূর চোখ যায় শস্যক্ষেত্র। কিন্তু জেঠুর যদি কিছু হয়! তার ভিতর থেকে কান্না উঠে আসছিল। জেঠু না থাকলে কার জন্য সে ছবি এঁকে রাখবে। জেঠু এলেই বলত, আন তোর ছবির খাতাখান, কী কী নতুন ছবি আঁকলি দেখি। বুঝলি বুমবাই, সব মানুষেরই একটা

স্বপ্নের পৃথিবী থাকে। ওটা থাকে বলেই মানুষ শত ঝামেলার মধ্যেও বেঁচে থাকতে ভালবাসে। আমার বাড়িতে গেলে দেখতে পাবি কত রকমের পাখি, গাছপালা, কীটপতঙ্গ। তোকে সব চিনিয়ে দেব। কার কী স্বভাব বলে দেব। তখন দেখবি তোর এই ছবিতেই তারা কেমন প্রাণ পেয়ে যাবে!

বুমবাই বলল, বাবা, কে তোমাকে চিঠিতে জেঠুর খবর দিল!

—তোর এক পিসি। আমার মামাতো বোন। লিখেছে, রাঙ্গাদার স্ট্রোক। আমরা আজই রওনা হয়ে যাচ্ছি। গিয়ে কী দেখব কে জানে!

বুমবাই বাবার পাশে বসে আছে। গাড়ি ছুটছে। বাবা আর কোন কথা বলছেন না। সে দেখল বাবার চোখে জল।

বুমবাইও চোখের জল রোধ করতে পারল না।

বাবা বললেন, আমরা বোঝতামই না, রাঙ্গাদা নিজের দাদা নয়। আমাদের পড়াশোনার দিকে তার ছিল সতর্ক দৃষ্টি। এসব মানুষ আর জন্মাবে না। আত্মভোলা মানুষ। টাকা পয়সার প্রতি কোন লোভ মোহ নেই। আত্মীয়-স্বজন যে যেখানে অভাবে অনটনে থাকে, দাদাকে চিঠি লিখলেই, হয় নিজে হাজির, নয় টাকা পয়সা পাঠিয়ে খবর নেওয়া। সংসারের কেউ তার পর না। বংশের কেউ কষ্ট পাচ্ছে শুনলে মানুষটা স্থির থাকতে পারে না। অথচ বুঝি তিনি নিজে কত একা! একা বলেই ফাঁক পেলেই তোকে দেখতে আমার কাছে ছুটে আসত। ফাঁকে আমাকেও তাঁর দেখা হয়ে যেত।

সাঁজবেলায় দূর থেকেই দেখা গেল বাড়িটা। এদিকটাতে এখন বিজলি বাতি এসে গেছে। বুমবাইকে বলল, ঐ দেখছিস, ওটাই তাঁর বাড়ি।

॥ সাত ॥

এমন একটা মজার পৃথিবীর মানুষ রাঙ্গাজেঠু ভাবতেই গা সির-সির করে উঠল বুমবাইর। মা এল না, ঝুপি এল না। বাবা রাগ করে তাকে একা নিয়েই চলে এসেছে। তাও রাঙ্গাজেঠুর স্ট্রোকের খবর না পেলে বাবা এখানে কোনোদিন আসতে পারে বিশ্বাসই হয় না। আসবে কী করে! তার স্কুল ছুটি হলে হয় পুরী, নয় দার্জিলিং। একবার বাবা তাদের নিয়ে দিল্লিতে গেছিল। সেখান থেকে আগ্রা মথুরা বৃন্দাবন হয়ে ফিরেছে। বড়দিনের ছুটিতে মামার বাড়ি কলকাতায়। কিন্তু মাকে কিছুতেই রাজী করানো যায়নি। রাঙ্গাজেঠু বছরে দু'বছরে গেলেই এক কথা, বৌমা, সবাইকে নিয়ে আমার ওখানে ক'দিন থেকে এস। ভাল লাগবে। মা'র বিশ্বাসই হয়নি, শহর থেকে ক্রোশ দুই দূরে রাঙ্গাজেঠু এমন একটা মজার পৃথিবীর মানুষ।

শীতকাল। সামনে জানলা। কোন্ সকালে তার ঘুম ভেঙে গেছে। কত সব পাখি ওড়াউড়ি শুরু করে দিয়েছে। জেঠু বলেছে, কোন্‌টা কী পাখি চিনিয়ে দেবে। কীট-পতঙ্গের নাম পর্যন্ত।

সে তড়াক করে লাফিয়ে উঠে পড়ল।

পাশে বাবা কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে। অত সকালে উঠতে দেখেই বলল, কীরে, উঠে পড়লি যে! রোদ উঠুক।

—আমি পাখি দেখব বাবা।

—ঠাণ্ডা লেগে যাবে। রোদ উঠুক। পরে উঠিস।

আর এ-সময় দরজায় টোকা। কেউ ডাকছে, আংকল।

বুমবাই আর স্থির থাকতে পারে না। দু'দিন হলো সে এখানে এসেছে বাবার সঙ্গে। এসেই দেখেছে কী সব বিশাল কাণ্ড-কারখানা! রাঙ্গাজেঠুর বড় ছেলে কোথায় কোন মার্কিন মুল্লুক

থেকে হাজির। জেঠুর স্ট্রোকের খবরে তার ছোট ছেলে থেকে যেখানে যত আত্মীয় সব হাজির। রাঙ্গাজেঠুর বড় ছেলেকে সে বড়দা ডাকে। বড়দার মেয়ে অরু। সুন্দর পরীর মতো সোনালী চুলের মেয়েটার সঙ্গে তার ভারি বন্ধুত্ব হয়ে গেছে। বড় ঠাণ্ডা পড়েছে। শীতে সে বড় কাবু। ফুল সোয়েটার গায়ে গলিয়ে বলল, যাই অরু। দাঁড়া।

তারপরই বুমবাই ভারি অস্বস্তিতে পড়ে গেল। অরুণিমা ঠিক একটা পাতলা লতাপাতা আঁকা ফ্রক গায় দরজার ওপাশে দাঁড়িয়ে আছে। এত শীতেও সে কোন সোয়েটার গায়ে দেয় না। ভারি অবাক লাগে তার। অরুণিমার বাংলা কথা শুনলে হাসি পায়। মেমবৌদি 'ভাল আছি' 'কী সোন্দর' এমন দুটো একটা বাংলা বলতে পারে। বুমবাই বলেছে, বড়বৌদি, তুমি কী! সোন্দর বলবে না, সুন্দর বলবে। অরুরও তাই। সারাদিন সে অরুণিমাকে শিখিয়েছে, রাঙ্গাজেঠু আমার বাবার মামাতো ভাই।

অরু বলেছে, মামতা বাই।

—ওহো. নো নো। মা···মা···তো ভা···ই। বল।

অরুণিমা বলেছে, মা···

বুমবাই বলেছে, মা···

অরুণিমা বলেছে, তু···

বুমবাই বলেছে, তু হবে না, তো, তো বল।

অরুণিমা বলেছে···তো···

—তাহলে কী হলো!

—মামতো।

—ধুস। বুমবাই ইংলিশ মিডিয়ামে প্রথম ভর্তি হবার সময় দিদিমণিরা ভেঙে ভেঙে যেভাবে ইংরাজি উচ্চারণ শেখাত ঠিক সে-ভাবে সারাটা দিন অরুণিমাকে 'রাঙ্গাজেঠু বাবার মামাতো ভাই' শিখিয়েছে। কিন্তু একটা জায়গায় সে বড় কাবু। শীতে তাকে ফুলহাতা সোয়েটার গায়ে দিতে হয়, অরুণিমা কোনো গরম জামাই গায়ে দেয় না।

সে বলেছে, শীত করে না!

—নো সিত।

—নো শীত বল।

—নো ছিত।

—ইস্ তুই কীরে! শী···ত। কোল্ডকে আমরা শীত বলি। শীত বল।

—সিত।

—তোর বংশে কে সিত বলে জানি না। তুই যে কী! তুই আমার বড়দার মেয়ে, তুই ছিত বলবি! ইস্ সবাই শুনলে কী হাসাহাসি না করবে!

—হাসা হিসি! হাসা হিসি কী!

—তুই একটা বুদ্ধু! হাসাহিসি শুনে বুমবাই ক্ষেপে গেছিল—আমার কাছ থেকে যা তুই! বুমবাই ইংরাজিতেই কথাটা বলেছিল। তোকে দিয়ে কিচ্ছু হবে না! হিসি বলতে কী 'বোঝায়, সেটা অরুণিমাকে কী করে বোঝাবে! বাংলা ভাষা এত মারাত্মক বুমবাই অরুণিমাকে বাংলা শেখাতে গিয়ে টের পেয়েছে। রাঙ্গাজেঠু ইজিচেয়ারে শুয়ে না ডাকলে সে এ-কাজের ভারই নিত না! রাঙ্গা-জেঠুর একমাত্র বংশধর শীতকে ছিত বললে খারাপ লাগবে না! হাসিকে হিসি বললে খারাপ লাগবে না! সে কী জানত এমন একটা বিপাকে পড়বে! সকালে সে রাঙ্গাজেঠুর পাশে দাঁড়িয়ে বলেছিল, কৈ জেঠু, তুমি যে বললে, কোনটাকে কী পাখি বলে চেনাবে; বলতে, আমার বাড়িতে গেলে দেখতে পাবি, কী সব বিশাল আম জাম গাছ আমার বাবা কাকারা লাগিয়ে গেছেন, কত সব পাখি উড়ে আসে, কত সব রঙিন প্রজাপতি···

তখনই রাঙ্গাজেঠু কেমন দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিল। বলেছিল, অরুটা বাংলা কিছু বোঝে। সব বোঝে না। বাংলা উচ্চারণ ঠিক নেই। তুই ওকে নিয়ে কোনটা কী গাছ, আমরা কে কার কী হই, বাড়িতে যারা আমাকে দেখতে এসেছে, তারা ওর কে হয়, আমরা কে কাকে

কি ডাকি, বুঝিয়ে দে। ওর সঙ্গে বাংলায় কথা বলবি। না বুঝতে পারলে ইংরাজিতে কী বলে বলবি। অরু ঠিক তখন সব বুঝতে পারবে। মাটির সঙ্গে বংশের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে না উঠলে, ও তো একসময় একা হয়ে যাবে। যা, আগে এ-কাজটা কর, তুই ক্লাস সিক্সে পড়িস, ইংরাজি মিডিয়ামে, তোদের সেন্ট জেভিয়ার্সের কত নাম, তাঁর নামে স্কুল। অমন স্কুলের ছাত্র তুই। তুই পারবি।

কাল সারাটা দিন জেঠুর সাম্রাজ্য অরুকে ঘুরিয়ে দেখিয়েছে। কোন্‌টা কী গাছ চিনিয়েছে। কিন্তু বাংলা উচ্চারণ শেখাতে গিয়ে এত বড় বিপাকে পড়বে বুঝতেই পারেনি।

সেই অরু কোন্ সকালে উঠে পড়েছে। তার ঘরের দরজার ও-পাশে দাঁড়িয়ে আছে। সে সোয়েটার পরে বের হবে—কিন্তু সে জানে সোয়েটার পরলে অরুটা হাসে। ওর হাসি দেখে টের পায়, তুমি আংকল ভেরি ওল্ড ম্যান। অরু ভারি মিষ্টি স্বভাবের। কেবল লাফায়। ছোটে। অরু জ্ঞান হবার পর এখানে এই প্রথম এসেছে। আট দশ বছর আগে একবার বড়দা বৌদিকে নিয়ে এসেছিলেন। বাবার কাছে শুনেছে, তখন রাঙ্গাজেঠু কলকাতার বাড়িতেই থাকতেন। ছোড়দা আর রাঙ্গাজেঠু। বাড়িতে মহাদেব আর রান্নার লোক ছাড়া কেউ থাকত না। ছোড়দা চাকরি নিয়ে বাইরে চলে যাবার পরই জেঠু বোধহয় আর কলকাতার বাড়িতে একা থাকতে পারছিলেন না। তিনি তাঁর বাবা কাকাদের পরিত্যক্ত আবাসে এসে উঠেছিলেন। বাড়ির গৃহদেবতার জন্য মন্দির বানিয়েছেন। দেবোত্তর সম্পত্তি সব। পতিত পড়েছিল।

সে বাবাকে প্রশ্ন করেছে, দেবোত্তর সম্পত্তি কী বাবা!

বাবা তাকে দেবোত্তর সম্পত্তি কী বুঝিয়ে দিয়েছে।

বুমবাই বলেছিল, পতিত পড়েছিল মানে!

বাবা বলেছিল, দেখার লোকজন ছিল না। আমার সব মামাতো ভাইয়েরা এক একজন এক এক মুল্লুকে। কার সময় আছে এত দেখাশোনা করে। রাঙ্গাদাই শেষ পর্যন্ত নিজের বাড়িতে কী

ভেবে ফিরে এলেন। বুঝলি বুমবাই, দেশ ভাগের পরই আমার মামারা সব এখানে চলে এসেছিলেন। দেশের জমিজমা বাড়িটা বিক্রি করে এক লপ্তে দেড়শ বিঘা জমি কিনেছিলেন মামারা। সব জমিই ঠাকুরের নামে কেনা হয়েছিল। রাজার পতিত জমি, বনজঙ্গল ছিল জায়গাটা। বড় সস্তায় জমি কিনে ঘরবাড়ি বানিয়ে ফেলেছিলেন। পাকা বাড়ি না। সব মাটির। উপরে টিনের চাল।

স্ট্রোকের খবর পেয়ে বুমবাই বাবার সঙ্গে যখন রেলগাড়িতে আসছিল, তখনই বাবা তাকে সব বলেছে। তার মনে হয়েছিল, জেঠুর বাড়িটা হবে মিকি-মাউসের বাড়ির মতো। জেঠুর বাড়িতে পৌঁছতে রাত হয়ে গেছিল। আবছা আলো অন্ধকারে সব স্পষ্ট ছিল না। ইঁটের ঘরবাড়িই মনে হয়েছে। সকালে উঠে বুঝেছে, আসলে ঠিক ইঁটের নয়, পাকা মেঝে, দেয়াল মাটির, রং করা। গেরিমাটি রঙের। ছোট ছোট কাঠের জানলা—ঘরের পর ঘর। মাথার উপরে টিনের ছাউনি দেখা যায় না। রঙিন ঘাসের বড় বড় টাইলস বসিয়ে ছাদের মতো করে নেওয়া হয়েছে।

রাঙ্গাজেঠুর ঘরটা সবচেয়ে বড়। খাট পাতা। সারি সারি কাচের আলমারি। আর রাজ্যের সব বই। তার মনে হয়েছিল, মা এলে এত বই দেখেই ঘাবড়ে যেত! বাপরে বাপ! একটা লোকের, এত বই লাগে! টেবিলের পাশে একেবারে আধুনিক বাতিদান, সোফাসেট। বেতের চেয়ার সাদা রঙের। সামনের লম্বা বারান্দায় বেতের চেয়ারগুলো পড়ে থাকে।

পরের ঘরটা লম্বা। পাশে বাথরুম। লাগোয়া একটা ঘরের দেয়াল ইঁটের। মাথায় জলের ট্যাংক। ঘরে ঘরে বেসিন, হাত-মুখ ধোওয়া যায়। বড় বাথরুম। বাথরুম বাড়ির দু-দিকে দুটো। একটা কাজের লোকদের, একটা রাঙ্গাজেঠুর নিজস্ব। বড় ফ্রিজটা রাখা হয়েছে, কাঁঠালতলার ঘরের দিকটায়। সেটা সে বোঝে রান্নাবাড়ি। একা মানুষ অথচ বেঁচে থাকার জন্য এমন এলাহি কাণ্ড। বুমবাইকে কিছুটা বোকা বানিয়ে দিয়েছিল।

সে বাবাকে বলেছিল, এত ঘর দিয়ে কী হয় বাবা! জেঠু তো একা!

বাবা তাকে বলেছে, একা কোথায়! কত লোক বাড়িতে দেখছিস। তোর পিসিরাই তো এক ডজনের কাছাকাছি—তাও দেখছি, অনেকে আসেনি। সবাই একসঙ্গে বাড়িতে এসে উঠলে, কেউ কোনো অসুবিধা ভোগ না করে, রাঙ্গাদা তার জন্য সব ব্যবস্থা করে রেখেছেন। এই যে তুই আমি এক ঘরে, তোর দাদারা এক এক ঘরে, পিসিরা এক এক ঘরে, রান্নাবাড়ির দিকটায় লপ্তে লপ্তে খাবার ডাক পড়ছে, বাড়িটা এত বড় না হলে সবাই থাকত কোথায়, উঠত কোথায়!

বুমবাইর তখন কী যে ক্ষোভ মা'র উপর! মা'র ধারণা, তার ভাইয়েরাই সব রাজালোক। বাবার আত্মীয়েরা সব প্রজালোক। দরজা খোলার আগে সে সাত পাঁচ ভাবছিল। সোয়েটারটা গায়ে দেওয়া ঠিক হবে কী না বুঝতে পারছে না।

উফ্ কী শীত! শহরে এত শীত লাগে না। পাড়াগাঁয়ে শীত বুঝি বেশি। বুমবাই খুব প্যাঁচে পড়ে গেছে। তারপরই মনে হলো, বাইরে বের হয়ে সামনের আমগাছতলায় দৌড়ে গেলে কিংবা মাঠের মধ্যে নেমে গেলে শীত করবে না। সকালটায় সে আজ ভাবল সারাক্ষণ দৌড়ঝাঁপ করবে, দৌড়ঝাঁপ করলে শরীর গরম থাকে। সোয়েটার না পরেই সে দরজা খুলে দিল।

আর সেই মেয়ে সামনে! সোনালী চুল, বব করা। পাতলা রেশমের উপর জরির কাজ করা ফ্রক। মুখে সেই সরল হাসি। ওর পাশে জলি মলি, বাবলু অপু দীপুরা। অরু সবার ঘরের দরজায় ডেকে যেন এখানে হাজির। সে বের হয়ে যেতেই বাবার গলা—এই বুমবাই, সোয়েটার গায়ে দিলি না!

—না!

—আরে ঠাণ্ডা লাগবে।

—না লাগবে না। বলেই ওদের সঙ্গে দৌড়ে বের হয়ে গেল। বুমবাই বুঝেছে, ছোটদের মধ্যে সেই সবার বড়। তার কথাই

শেষ কথা। অরু পর্যন্ত তাকে সমীহ করে। অরুই একমাত্র মেয়ে যে সবাইকে আংকল কিংবা আন্টি বলে। আজও তাকে আংকল বলে ডেকেছে। সে ভিতরের লম্বা করিডোর দিয়ে যাবার সময় বলল, অরু, আবার তুই আংকল বলছিস! তুই কীরে! কাকা ডাকবি। বুমবাই কাকা, একশবার বললেও দেখছি তোর কিছু মনে থাকে না। মাথায় কি তোর গোবর পোরা আছে!

অরু বলল, কাকা।

—বল, বুমবাই কাকা।

—বোমবাই কাকা।

—বোমবাই না। বুমবাই।

এই চলে সারাদিন। বারান্দায় এসে দেখল রাঙ্গাজেঠু ইজি-চেয়ারে শুয়ে আছেন। গায়ে মোটা সুতির কম্বল জড়ানো। পাশে মেমবৌদি টি-পট থেকে লিকার ঢেলে জেঠুর চা দিচ্ছে। বড়দা একটা গাছের নিচে দাঁড়িয়ে, ডালে পাতায় কী যেন খুঁজছে। ছোড়দা বড়দার কাছছাড়া হচ্ছে না। দু'দিন ধরেই দেখেছে যেখানে বড়দা, ঠিক সেখানে ছোড়দা। বড়দাকে না দেখতে পেলেই কেমন দিশেহারা হয়ে পড়ছে।

—এই বুমবাই, বড়দা কোথায় গেল রে!

বড়দারও এক কথা, এই বুমবাই, ছোটন গেল কোথায়!

সে বোঝে, আসলে বড়দা ছোড়দা এখন এখানে রাঙ্গাজেঠুর কাছে চলে এসে, তার আর ঝুপির মতো হয়ে গেছে। ছোট্ট হয়ে গেছে। কথায় কথায় দু'ভাইয়ে তুমুল তর্ক—বড়দা বলবে, আমি আর ফিরছি না। বাবা যাই বলুক।

ছোড়দা বলবে, আলবৎ ফিরবে। বিদেশে পড়ে থাকবে! বাবাকে দেখে বুঝছ না, কেমন একা হয়ে গেছেন! ওখানে প্রাচুর্য আছে মানি। কিন্তু প্রাচুর্যই তো সব নয়। মনের দিক থেকে দেউলিয়া হতে হয়। জীবনে কিছুটা অনটন থাকা চাই। হাতের মুঠোয় সব পেয়ে গেলে বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষা মরে যায়।

বড়দা বলবে, মোটেও না। ওটা তোর ভুল ধারণা ছোটন। তোকে এত করে বললাম, আমার সঙ্গে চল—গেলি না। নোংরা রাজনীতি চলছে। শুনেছি একটা এম. এল. এ. পর্যন্ত তোদের নাকি আজকাল ধমকধামক দেয়। অশিক্ষিতের রাজত্ব।

বুমবাই অবাক হয়ে যায়। বড়দা ছোড়দা দু'জনই একসময় কেমন ছেলেমানুষ হয়ে যায়! একজন বলবে—তুই কিছু জানিস না!

অন্যজন বলবে, তুমি সব জেনে বসে আছ।

তারপর দু-ভায়ে তুমুল তর্ক।

—তুমি আমার সঙ্গে কোনো কথা বলবে না!

—তুই আমার সঙ্গে কথা বলিস তো ভাল হবে না!

বুমবাই তখন চুপিচুপি গিয়ে রাঙ্গাজেঠুকে খবর দেয়, জান জেঠু, বড়দা আর ছোড়দা না বাঁশঝাড়ের ওদিকটায় ঝগড়া করছে।

—যা বলগে, আমি দুটোকেই ডাকছি।

বুমবাইর তখন কাজ ছুটে যাওয়া। বুমবাইর সঙ্গে সঙ্গে সবাই তখন ছুটতে থাকে। কাঁঠালতলা পার হয়ে বড় একটা পুকুর, শান বাঁধানো ঘাট। ঘাটে বাবা বঁড়শি ফেলে কম্বল মুড়ি দিয়ে বসে। ফাতনায় চোখ। বুমবাই যে তার দলবল নিয়ে ছুটছে বাবা দেখতেই পায় না। বুমবাইর ভারি মজা লাগে। এখানে এসে সবাই কেমন ছেলেমানুষ হয়ে গেছে। তার বাবা পিসিরা সবাই। পিসিরা কামরাঙ্গা গাছের নিয়ে দাঁড়িয়ে। হাতে লম্বা কোটা। মগডাল থেকে একটা দুটো পাকা কামরাঙ্গা পাড়ছে, আর কে ওটা নেবে, ধরবে এই নিয়ে কাড়াকাড়ি চলছে।

—বড়দা, রাঙ্গাজেঠু তোমাকে ডাকছে।

বড়দা তখন বলবে, এই ছোটন, চল, বাবা ডাকছে।

—আমাকে ডাকছে না। তোমাকে ডাকছে। তুমি যাও।

বুমবাই তখন হেসে ফেলে। জেঠুকে দু'জনই দেখছি যমের মত ভয় পায়।

সে বলল, ছোড়দা, তোমাকেও ডাকছে।

—আমাকে ডাকবে কেন, আমি কী করেছি!

—বলল যে দুটোকেই ডাক।

বুমবাইর মনে হয় যেন জেঠু দু'জনেরই কান মলে দেবে। বলবে, আবার ঝগড়া শুরু করলে। তোমাদের নিয়ে দেখছি আমার অশান্তির শেষ নেই।

বড়দা বলবে, যা বলগে, যাচ্ছি।

—যাচ্ছি না! এক্ষুণি যেতে বলেছে।

বড়দার কেমন কাঁচুমাচু মুখ।—এই ছোটন, বাবা ডাকছে। চল।

—তুমি যাও।

—বা রে, তোকেও যে ডাকছে!

—আমাকে ডাকেনি!

—এই বুমবাই, দু'জনকেই ডেকেছে না!

—হ্যাঁ। বলল, দুটোকেই ডাক। তোমরা ঝগড়া শুরু করেছ শুনে ডাকছে।

—কে বলল, আমরা ঝগড়া করছি!

—বা রে, তোমরা ঝগড়া করছিলে না!

—কখন ঝগড়া করলাম!

—সে আমি জানি না। জেঠু তোমাদের ডেকে দিতে বলল। বলেই বুমবাই এক দৌড়। কেউ তাকে শাসন করে না। সকাল বেলায় বাবা ঘর থেকে দৌড়ে বের হয়েছিল। সে সোয়েটার গায়ে দেয়নি বলে বাবা তটস্থ।—বুমবাই, ঠাণ্ডা লেগে যাবে—দেখছ রাঙ্গাদা কাণ্ড। তোমার নাতিন পাতলা ফ্রক গায়ে দেয়, শীত করে না, বুমবাইরও নাকি শীত করে না। অরু শীতের দেশের মানুষ, তার ঠাণ্ডা লাগতে নাই পারে, তাই বলে তুইও!

সে দূর থেকেও শুনতে পায়। রাঙ্গাজেঠু বলছে, সেটা বুমবাই বুঝবে। তোর এত মাথাব্যথা কেন বুঝি না। ছেলেমানুষ, তোর

আমার মতো শীত লাগবে কেন? বাইরে বের হয়ে একদণ্ড স্থির থাকছে না, শরীর এমনিতেই গরম হয়ে যায়। ও নিয়ে তোমার মাথাব্যথার দরকার নেই। বৌমা—দেবুকে চা দাও। একটু থেমে রাঙ্গাজেঠু বলেছিল, মুখ ধুয়েছিস!

বাবা একেবারে তখন বুমবাই। কী বলবে ভেবে পাচ্ছে না! বারান্দার পরেই কটা সূর্যমুখী ফুলের গাছ। তাতে বড় বড় ফুল। বুমবাইরা তার নিচে এসে গেছে—শুনতে পাচ্ছিল, রাঙ্গাজেঠুর গলায় ধমকের সুর। এত বেলা করে ঘুম থেকে উঠিস—শরীর ভাল থাকবে কী করে! বেশি ঘুমোলে জানিস তো রক্ত ঠাণ্ডা মেরে যায়। তোরা যে কী হলি! সূর্যোদয়ের আগে বিছানা ছাড়তে হয় জানিস না! না ছাড়লে পরমায়ু কমে। যা, হাতমুখ ধুয়ে নে। বৌমা, চা দাও।

এই সব মজা মা তার দেখতে পেল না। বাবা গোমড়া মুখে ঘরে চলে গেছে। বুমবাইকে শাসন করতে না পেরে ক্ষেপে আছে। আর জেঠু এমন ধমক লাগাল যে সত্যি যেন বাবা মহা অপরাধ করে ফেলেছে। হাত মুখ ধুয়ে এসে গোমড়া মুখেই সামনের বেতের চেয়ারে বসে বলল, দাও বৌমা চা দাও।

যেমন সে বাবা বকলে গুম মেরে টেবিলে খেতে বসে, বাবাও তেমনি গুম মেরে আছে। আসলে বাবা বুঝতে পারে জেঠুর সামনে তাকে শাসন করার অধিকার বাবার নেই।

বাবা তার কেমন একেবারে খোকা হয়ে গেছে। বড়দা ছোড়দাও। কেউ আগে যেতে চাইছে না। এ ওকে ঠেলে দিচ্ছে।

বুমবাই কেমন গম্ভীর গলায় ফের বলল, তোমরা দাঁড়িয়ে থাকলে কেন! যাও। আসলে এরা চলে না গেলে সে অরু এবং তার সাঙ্গোপাঙ্গরা ছুটতে পারবে না। এমন একটা গাছপালা বনজঙ্গল নিয়ে এদিকের জায়গাটা যেন জেঠু তাদের জন্যই বানিয়ে রেখেছে। বাঁশঝাড়, তারপর শ্যাওড়া গাছের জঙ্গল, মণীন্দ্রকাঁটার জঙ্গল। এবং

এই জঙ্গলে কত সব প্রজাপতি, শীতের অলস রোদে সব মাখামাখি। পরম এক উষ্ণতার ছবি। অরুর কত রকমের প্রশ্ন, বুমবাই কাকা, আমাকে ফড়িং ধরে দাও। আধা ইংরেজি, আধা বাংলায় কথা বলছে। সবটা বলতে পারে না। অরু সবটা বলতে না পারলে নিজেই লজ্জায় পড়ে যায়। বুমবাইর কাছে জেনে নিতে চায় কী ভাবে সে বলবে।

বড়দা ছোড়দা কেমন ভীতু বালকের মতো পুকুরের পাড় ধরে হাঁটছে। এদিকটায় দু দুটো পুকুর। একটাতে সব বড় মাছ। আর একটাতে জিওল মাছ—এই যেমন কই শিঙি মাগুর। জেঠু বলেছে, দেখবি বিকেলে তোকে মাছ কী করে ধরতে হয় শিখিয়ে দেব। তাকে জেঠু একটা ঘরে নিয়ে—কত রকমের বঁড়শি দেখিয়েছে।—এই যে বঁড়শিটা দেখছিস, এটায় কই মাছ, এটায় শিঙি মাগুর। চার পাঁচটা হুইলের ছিপ। জেঠু নাকি বিকেলে মাঝে মাঝে বসে মাছ ধরে। মাছ ধরায় নাকি দারুণ উত্তেজনা।

বিকেলেই সে যখন জেঠুর সঙ্গে ছিপ নিয়ে যাচ্ছিল তখন বুঝতে পেরেছিল, সত্যি কী মারাত্মক ব্যাপার। মহাদেব দাদু বোলতার চাক ভেঙে এনে রেখেছে। বাড়িতেই সব। পিঁপড়ের ডিম। গাছের মগডালে উঠে মহাদেব দাদু চিৎকার করছিল, সরে যাও ভাইবোনেরা। মহাদেব দাদুটা সবার নাম মনে রাখতে পারে না। পারবে কী করে—তারা সাত আটজন সমবয়সী, একসঙ্গে স্নান, মহাদেব দাদু পুকুরে নিয়ে গিয়ে কী করে ডুব দিতে হয় শিখিয়েছে। ডুব দিতে না জানলে সাঁতার শেখা যায় না। অরুকে, তাকে, বাবলুকে সাঁতার শেখানোর দায়িত্ব মহাদেব দাদুর। দাদু বলেছে পাঁচ-সাত দিনেই সেটা হয়ে যাবে।

শীতের সময় বলে গাছের পাতা ঝরা শুরু হয়েছে। জোর হাওয়া দিলে গাছের পাতা উড়তে থাকে। সারা বাড়িটা ঝরা পাতার খেলা। সকালে মনসা দাদার একটাই কাজ—গাছের নিচে

সব পাতা ঝাঁটা দিয়ে ডাঁই করা। যত গাছ তত তার পাতা। একেবারে ঝরা পাতার পাহাড়। গোয়াল বাড়িটা পেছনে। শান-বাঁধানো লম্বা চত্বর। মাথায় টালির ছাউনি। মাঝখানে শান-বাঁধানো গরুর জাবনা দেবার আট-দশটা গামলা। মনসা দাদার ঐ একটাই কাজ। সকালে গাছের নিচে, বিকেলে গরুর ঘরে। সন্ধ্যায়, গোবর ডাঁই করা। বিশাল একটা গর্ত, প্রথমে সব ঝরা পাতা ঝুড়িতে করে এনে বিছিয়ে দেয়। যেখানে যত গাছ আছে, তার নিচ থেকে ঝরা পাতা তুলে আনে—জেঠু কিছুই বলে না। যেন যে যার মতো নিজের কাজ করে যাচ্ছে। বুমবাই কোনটার মজা আগে লুটবে ভেবে পায় না। সব কিছুই তার কাছে বিস্ময়। বড় একটা ঢোলের মতো মাদুলি গলায় মনসা দাদার। কেন এটা, সে একবার প্রশ্ন করেছিল—মনসা দাদা বলেছিল, তা তেনারা হাঁটাহাঁটি করেন রাত হলে। গলায় পরে আছি। সাহস হয় না তেনাদের কাছে আসতে।

—তেনারা কারা!

—তেনারা! নিজের বুকে থুথু ছিটিয়ে দেয় মনসা দাদা।

—বল না, তেনারা কারা! তুমি কী মনসা দাদা, কেবল তেনারা তেনারা করছ!

—ঐ হলো গে মানে, বোঝলেন না, বাড়িটায় আমরা একা থাকি! বেটা মহাদেবটা ভূত পোষে!

—একা কোথায়! মহাদেব দাদু ভূত পুষবে কেন?

—ও রাঙ্গা কর্তার কথা কন। তেনার এ-সবে বিশ্বাস কম। মহাদেব যে ভূতের ওঝা বিশ্বাসই করে না।

—ওঝা, ভূত, কী যে বলছ না!

—ভূত প্রেতে খাবে বেটাকে। বেটা মরবে।

—কী বলছ! বাড়িটাতে ভূত-প্রেত থাকে?

—বা রে, মানুষ থাকবে, তেনারা থাকবেন না। যাবেন কোথায়! পুকুর পাড়ের বড় শালগাছটা আছে না, ওখানে তেনারা দল বেঁধে থাকেন!

তা পুকুরের পাড়ে শাল, শিমুল, পলাশ এমন সব কত না গাছ। শীতের সময় পুকুরটায় এক ফোঁটা রোদ ঢোকে না। জল যেন বরফ হয়ে থাকে।

বড় পুকুরের পাড়ে কোনো গাছ নেই। সারাদিন পুকুরের জল রোদ পায়। শান-বাঁধানো ঘাট। এই ঘাটে জেঠু শানের উপর রোদে বসে তেল মাখেন। জিওল মাছের পুকুরটার কথাই তবে মনসা দাদা বলছে। তার পাড়ের গাছপালাতেই ভূতেরা থাকে। তা ঠিক, সে ভেবে পায় না, একটা পুকুরের পাড়ে কোনো গাছ নেই, না নেই বললে ভুল হবে, আছে, সারি সারি নারকেল গাছ। অন্য কোনো গাছ নেই। আর ছোট্ট পুকুরটার পাড়ে এত গাছ কেন! ভূত পুষতেই পারে মহাদেব দাদু।

সে জেঠুকে বলেছিল, ও জেঠু, এত গাছ কেন!

জেঠু বলেছিল, জিওল মাছ ঠাণ্ডায় বাড়ে। দেখছিস মাছ কেমন গাবাচ্ছে!

তা দেখার মতো বটে! সারা পুকুরের জলে হঠাৎ হঠাৎ ঝড় বয়ে যায় যেন, এক কোণায় কোথাও একটা মাছ গাবান দিল তো খৈ ফোটার মতো সারা পুকুরটা নড়েচড়ে বসল। জেঠুর এক কথা, বুঝলি কিছু!

—কী বুঝব!

অরু জেঠুর কোঁচা ধরে দাঁড়িয়ে থাকে। অরু বোধ হয় এসবের কোনো মর্মই বুঝতে পারে না। অরু যে-দেশটায় থাকে, সেখানে ডিজনিল্যাণ্ডের কত সব বিচিত্র খবর আছে মানুষের—কিন্তু অরুর মুখ চোখ দেখে মনে হয় এমন আজব দেশের খবর সে কোনোদিন পায়নি। দু-দিন ধরেই লক্ষ্য করছে অরু এত সব দেখতে দেখতে

কেমন বোকা বনে গেছে। সব আত্মীয়-স্বজন, তাঁদের পোশাক-আশাক, তার দাদুর আচরণ সবই কেমন অদ্ভুত। তার বাবা পর্যন্ত এখানটায় এসে সব কথায় বলছে, ডাকব তোমার দাদুকে! আর অরু মাঝে মাঝে সাড়া না দিলে, বড়দার হাঁক, বাবা দেখ অরু সাড়া দিচ্ছে না! কোথায় গেল!

তখনই রাঙ্গাজেঠুর গলা পাওয়া যাবে—কোথায় যাবে, কোথাও আছে। এই দিদিভাই, তুই কোথায় রে! দিদিভাই ডাকলে অরু যেখানেই থাক, সাড়া না দিয়ে পারে না।—যাই দাদু!

জেঠুর তখন এক কথা, কী হলো, ঐ তো সাড়া দিচ্ছে। আর দৌড়ে এসে জেঠুর কোলে ঝাঁপিয়ে পড়লে দু'হাতে জেঠু বুকে তাকে জড়িয়ে ধরেন। আর আদরে আদরে পাগল করে তোলেন। তখন তার যে কী হিংসে হয় না! মাঝে মাঝে বুমবাই দেখতে পায় রাঙ্গাজেঠুর চোখ দুটো জলে চিকচিক করছে। জেঠুর জন্য ওর তখন ভারি কষ্ট হয়।

আর অরু যেই আদর খেয়ে বুমবাইর কাছে ছুটে আসবে তখনই সে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠবে।

—এই তোর সঙ্গে আড়ি।

—আড়ি! হোয়াট আড়ি!

—আড়ি মিনস নো টক। নো কথাবার্তা।

অরু হেসে গড়িয়ে পড়ে।—বুমবাই কাকু বোবা।

—আমি বোবা!

—বোবা।

—আবার আমাকে বোবা বলছিস!

—কথা বলতে না পারলে বোবা হয় না!

—কথা বলতে পারি না কে বলল?

—এই যে বললে কথা বলবে না।

আর তখন বুমবাইর রাগ কেমন জল হয়ে যায়। অরু আড়ি

কী বোঝেই না। আড়ি না বুঝলে, তার সঙ্গে আড়িও করা যায় না। সে পড়ে যায় মহাফাঁপরে। অরুকে নিয়ে ঘুরতে না পারলে, ছুটতে না পারলে কেমন এক জীবনের মহারহস্যের খবর থেকে বঞ্চিত। সেই পারে না অরুর সঙ্গে আড়ি করতে। এমন একটা সরল সুন্দর হাসিখুশি মেয়ের সঙ্গে আর যাই করা যাক আড়ি করা যায় না।

এখন তারা যাচ্ছে মাছ ধরতে।

বুমবাইর হাতে একটা ছোট ছিপ, অরুর হাতে ছিপ। জেঠ্ সবার হাতে ছোট ছোট ছিপ দিয়েছেন। সঙ্গে মহাদেব দাদু। সকালে উঠেই সে দেখতে পায় মহাদেব দাদু কোত্থেকে বিশাল একটা তাজা রুই মাছ এনে রান্নাবাড়ির বারান্দায় ফেলে রেখেছে। মাছটা লাফাচ্ছিল। মেমবৌদি অরু মাছ খেতে জানে না। কাঁটা মাছ খায় না। ওদের জন্য কটা পাবদা মাছ। তাও তাজা ঝকঝকে রুপোর পাতের মতো। জেঠ্ গজগজ করেছে, মাছের কাঁটা বেছে খাওয়ার মধ্যে যে আনন্দ আছে, তার নাতিনটা সে সুখ টেরই পেল না। জেঠুর এক কথা, বড়টা অমানুষ, ছোটটা গোঁয়ার। মেয়েটাকে কাঁটা বেছে মাছ পর্যন্ত খাওয়াতে শেখায়নি! কী যে হবে! মহাদেবকে বলেছে, মাছ ভেজে রাখবি। কী করে কাঁটা বেছে খেতে হয় শিখিয়ে দেব। আর অরুকে নিয়ে বুমবাই এবং সবাইকে নিয়ে তিনি যখন খেতে বসেন, অরু ঠিক জেঠুর পাশটায় বসে। অরু চামচ দিয়ে খেতে চায়—জেঠ্ বলবে, না হাত দিয়ে খাও। দেখ নিজের হাতে খাওয়ার মধ্যে কত আনন্দ।—এই দেখ, মাছের কাঁটা কী করে বাছতে হয়। দেখলে তো, এবার খাও। ভাত সব পড়ে যাচ্ছে কেন! তোর মা-বাবা ভাত খাওয়াটাও পর্যন্ত শেখায়নি! কী যে হবে! যেন জেঠুর জীবনে অরু ভাত মেখে খেতে পারে না বলে মহা বিপর্যয় নেমে এসেছে। বুমবাইর দিকে তাকিয়ে বলবে, দেখ তো বুমবাই, বাবলু অপুরা কেমন ভাত মেখে খাচ্ছে।

বারান্দায় মাছটা লাফাচ্ছিল [পৃঃ ৫৬

অরু তখন নিজেই জেঠুর হাত সরিয়ে বলবে, আমি পারব।
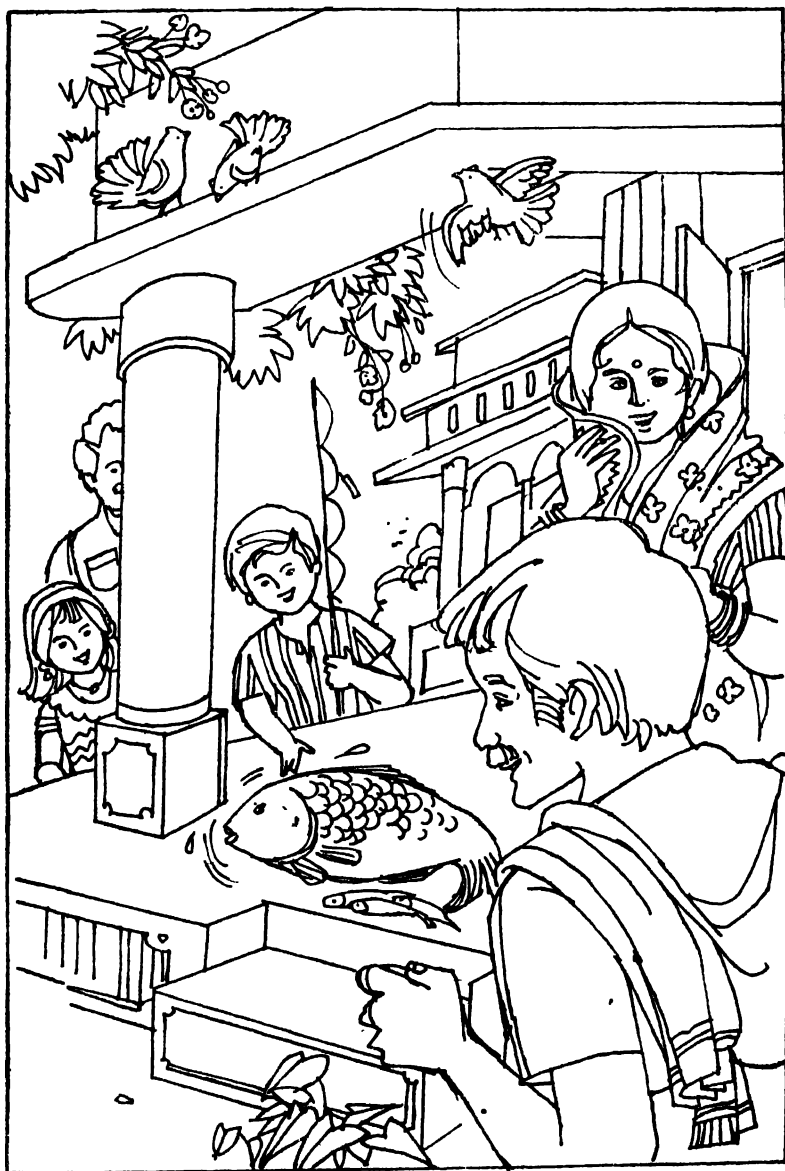
তুমি দেখ না। অরুও চায় না, ভাত মেখে খাবার ব্যাপারে সে খুব আনাড়ি, কারণ অরু জানে, পরে তাকে সবাই ক্ষেপাবে। অরু সবার দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর কেমন নিজেই ডাল দিয়ে ভাত মাখে। শুকতোনি দিয়ে ভাত মাখে। অরুটা একদম ঝাল খেতে পারে না।

মহাদেব দাদু, অরু আর মেমবৌদির জন্য শুধু আদাবাটা আর জিরা দিয়ে ঝোল করে দেয়। তারপর টক, তারপর ঘরে পাতা দই। জেঠু নিজে বিশেষ কিছু খায় না। দুপুরে, রাতে জেঠু ছোটদের সবাইকে নিয়ে খেতে বসেন। জেঠুর তেল ঝাল সব বারণ। তার জন্যও এক প্রস্থ আলাদা রান্না। বুমবাইর কেমন তখন আর খেতে ইচ্ছে করে না। জেঠু কিছুই খায় না! অথচ জেঠু তাদের বাড়ি গিয়েছিল, একটা বড় এনামেলের হাঁড়িতে কই মাছ নিয়ে।

কই মাছ কাটা নিয়ে মার কী সে বিড়ম্বনা! তার এখনও দৃশ্যটা ভাবলে হাসি পায়। মাছগুলো হাঁড়ির ঢাকনা খুলে দিতেই টুপটাপ ফুল ফোটার মতো ফুটছিল, ঝরছিল। সারা ঘরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। একটা তুলতে গেলেই আঁচড়।

এদিকে জেঠু তাদের বসার ঘরে বসে পত্রিকা ওল্টাচ্ছিলেন। বাবা অফিসে। হঠাৎ দেখেন একটা কই মাছ তাঁর পায়ের কাছে হামাগুড়ি দিচ্ছে। ওদিকে যে রান্নাঘারে দক্ষযজ্ঞ শুরু হয়ে গেছে জেঠু টের পাবেন কী করে!

কাজের মেয়েটা মা'র হাতে রাশি রাশি ডেটল ঢালছে। মা'র বিরুদ্ধে জেঠুর 'এমনিতেই অভিযোগের অন্ত নেই—এ কী বৌমা, সকালে উঠেই ছেলেটাকে ডিম সেদ্ধ পাউরুটি দিচ্ছ। ওতে শরীর টেকে! এ কী বৌমা, কী চেহারা হয়েছে বুমবাইর! খেতে চায় না বললেই হলো। রোজ এক খাওয়া কার ভাল লাগে। কই মাছ নিয়ে না আবার কত রকমের অভিযোগ উঠবে—তোমার বাবা মা কই মাছ খায়নি কখনও?

মা মুখ বুঝে জ্বালা সহ্য করছে, মুখ ফুটে একদম উঃ আঃ করছে না। জেঠু ভিতরে ঢুকে হতবাক। সারা ঘরে কই মাছগুলি হেঁটে বেড়াচ্ছে। যেন তাদেরই ফ্ল্যাট। বুমবাইরা বাড়তি মানুষ।

জেঠু আর কী করেন। ত্রাতার ভূমিকায় নেমে পড়লেন।

একটা করে কই মাছ ধরেন, আর বলেন, এই দেখ, এভাবে। মাথার দিক থেকে হাত দেবে। কানকো চেপে ধর জোরে। ব্যস, সব জারিজুরি শেষ।

জেঠু কাজের মেয়ে ফুলদিকে ডেকে বলেছিলেন, দেখি বঁটি !

বঁটি পাবে কোথায় ! ফ্ল্যাটে সব ছুরি কাঁচিতে কাজ। তরকারি কাটা, পেঁয়াজ কাটা সব খচ খচ করে মা রান্নাঘরের বেসিনের পাশে টাইলসের উপর রেখে কাটে। কাটা পোনা ছাড়া খাওয়া হয় না। একটা বঁটি যে ছিল না, তা নয়। তবে তার কোনো কাজ নেই। বঁটিটা রান্নাঘরের একপাশে গোমড়ামুখে পড়ে থাকে।

বঁটিতে ধার নেই।

বালিতে ঘষে ধার তুললেন জেঠু।

কই মাছ কী করে কাটতে হয় শিখিয়ে দিলেন জেঠু। তারপর দুটো কলাপাতার মধ্যে মাছগুলি সরষে বাটা, নুন, কাঁচালংকা আদা বাটায় মেখে সাজিয়ে আবার কলাপাতায় ঢেকে গরম ভাত খানিকটা ঢেলে মাছগুলি চাপা দিলেন। ভাতে সেদ্ধ কই খাওয়ালেন সবাইকে।

আঃ, সে কী স্বাদ !

বাবা অফিস থেকে এসে দেখলেন মা হাতে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে শুয়ে আছে।

বাবা মাকে সেদিন মাছ বেছে খাইয়েও দিয়েছিলেন। জেঠু আবার দেখে না ফেলে সেজন্য শোবার ঘরে বাবা থালায় ভাত বেড়ে মাছের বাটি নিয়ে পালিয়ে যখন খাওয়াচ্ছিলেন, তখন ঝুপির কী হাসি ! তারও হাসি পাচ্ছিল। কিন্তু জেঠুর কাছে বসে থাকার

নির্দেশ ছিল। জেঠুর কাছে ছবি আঁকতে বসলে, তিনি ছেলেমানুষের মতো উবু হয়ে বসে তার ছবি আঁকা দেখেন। ছবি আঁকা, জেঠুকে পাহারা দেওয়া দুই কাজ একসঙ্গে।

বাবা বলেছিলেন, তুমিই পার জেঠুকে আটকে রাখতে। যাও, জেঠুর ঘরে। ছবি আঁকতে বসে যাও। না'লে এদিকে এসে পড়তে পারেন।

জেঠুকে আটকে রাখার মোক্ষম অস্ত্র ছবি আঁকা সে যতক্ষণ ছবি আঁকবে, জেঠু এক পা নড়বে না।

—হলো না। লেজটা ঠিক হয়নি। ছাখ।

দু'টানে পাখির লেজ, গাছ, ফুল, ফল, নদী সব এঁকে বলবেন, কী দেখলি, কেমন হলো!

সে সত্যি অবাক হয়ে যায়।

সেই জেঠু ওদের নিয়ে বিকেলে আজ মাছ ধরতে যাচ্ছে। বড় বড় আমগাছের ছায়া পার হয়ে বাঁশ বাগানের একপাশে পুকুর। কত সব গাছ, আর পাখির কিচির মিচির শব্দ। জেঠু বলে যাচ্ছে—

এরা হলো সাত ভাই চম্পা পাখি।

—ঐ যে দেখছিস ঝুপ করে পুকুরে ডুবে গেল পাখিটা, ওটা মাছরাঙ্গা পাখি।

—ঐ দেখ ঝোপের মধ্যে ক'টা ডাহুক। ওহো ঢিল ছুঁড়বে না।

অরু বলল, কী সোন্দর।

জেঠু বলল, বুমবাই, কী শেখালি? সোন্দর বলছে।

—ওর হবে না জেঠু। হাসাহাসি কে হাসাহিসি বলে!

—হবে। আমার কাছে থাকলে হবে। সব হবে। মাছ ধরায় আনন্দ কী দেখ। বলেই জেঠু তার জায়গায় গেলে মহাদেব দাদু একটা মোড়া পেতে দিল। একটা বালতি ঢাকনা দেওয়া। কলা-পাতায় পিঁপড়ের ডিম। জেঠু বললে, দিদিভাই, আমার পাশে এসে বোস।

মহাদেব দাদু অরুর বঁড়শিতে পিঁপড়ের ডিম গেঁথে দিচ্ছে।

বুমবাই বলল, আমারটা।

—সবাইকে দিচ্ছি।

জেঠু ছিপ ফেলতে না ফেলতে ফাতনা কাত করে নিয়ে গেল। আর টেনে তুলতেই লাল বুকয়ালা বিশাল কই মাছ একটা।

জেঠু বলছে. বুমবাই, টান টান। দেখ ফাতনা টানছে।

সেও টানতে গিয়ে আর তুলতে পারছে না।

অরুটা বঁড়শি ফেলে তখন লাফাচ্ছে।

—ও জেঠু! উঠছে না।

ছিপের ডগা বেঁকে গেছে। জলের নিচে ঘূর্ণি উঠছে। বুমবাইর কেমন ভয় ধরে যাচ্ছে। জেঠু বলে যাচ্ছে, টান টান। আহা পড়ে যাচ্ছিস কেন!

অরু এসে বুমবাইর ছিপ ধরে ফেলল। আসলে বুমবাই টের পায় যেন এই কালো জলের গভীরে কোনো অপদেবতা বাস করে। তাই বঁড়শিটা টেনে রাখতে পারছে না। সে জোর হারিয়ে ফেলেছিল। কী সাংঘাতিক জোর। জেঠু উঠে এসে ছিপটা ধরে ফেলল। বলল, দেখ।, দেখলি! এটা ফলি মাছ। কত বড় দেখেছিস!

বুমবাই বলল, কী জোর জেঠু!

—হবে না। প্রাণের দায়। জোরে ছুটছে, তুই টানছিস। মাছটা জলে লেজ বাঁকিয়ে রাখছে। ভারি লাগছে। ভাগ্যিস পড়ে যাসনি।

মাছটা লাফাচ্ছিল।

বুমবাই দেখল, জেঠু আর মাছটার দিকে তাকাচ্ছে না। নিজের ফাতনার দিকে তাকিয়ে বলছে, জানিস, ফাতনা নড়লেই টের পাই, কী মাছ ভিড়েছে। বুমবাইর অত সব শোনার সময় নেই। সে

এত বড় একটা মাছ জলের নিচ থেকে তুলে এনেছে—আহা মা থাকলে বুঝতে পারত, ঝুপিটা এলে কী না লাফাতে পারত এখন—যেমন অরু লাফাচ্ছে। কখনও বসছে। মাছটা হাত দিয়ে ধরার চেষ্টা করছে। আর মাছটা লাফ দিলেই ছুটতে গিয়ে উল্টে পড়ে যাচ্ছে অরু। জেঠুর বাড়িতে এত মজা! ঝুপি এলে কী না মজা হতো!

জেঠু নির্বিকার। বুমবাইর দিকে না তাকিয়েই বলছে, মাথাটা চেপে ধর। দেখবি নড়তে পারবে না।

অরু কাছে এলে এক ধমক লাগাল বুমবাই।—সর। সুন্দর বলতে পারে না! হিসি বলে! তুই বঁড়শি থেকে মাছ খুলবি! তা হলেই হয়েছে!

অরু সব কথা ঠিক ঠিক বুঝতে পারে না। ফ্রক কোমরে তুলে উবু হয়ে বসে মাছটার লাফঝাঁপ দেখছে। একটু ঠাণ্ডা হলেই হাত দিতে যাচ্ছে। বিশাল একটা কাজের দায় এখন বুমবাইর কাঁধে। মাছটাকে বঁড়শি ছাড়িয়ে বালতিতে রাখতে হবে। অরু বাবলু অপুরা কী করবে ভেবে পাচ্ছে না। মাছটার চারপাশে ঘিরে বসেছে। যেন পালাতে না পারে।

জেঠু বলে যাচ্ছে, শিং মাছগুলো তো দেখছি বড় জ্বালাচ্ছে। গিলবেও না, চারপাশে কেবল ঘোরাঘুরি করছে।

কী বলে! বুমবাই মাছটা ফেলে এসে বলল, কোথায় শিং মাছ দেখি!

—দেখবি কী করে! জলের নিচে দেখা যায়?

—তুমি টের পাও কী করে!

—ফাতনা কী ভাবে নড়ছে দেখছিস?

তা সে দেখছে। একটু তলিয়ে নিয়ে গিয়েই ছেড়ে দিচ্ছে। জেঠু বার বার হেঁচকা মেরেও মাছ আটকাতে পারছে না।

বুমবাই বলল, ভারি পাজি তো।

জেঠু বলল, দুষ্টুমি করছে। চুউপ। কথা বলিস না। মাগুর মাছ। খাবে।

বুমবাই অবাক হয়ে যায়। ফাতনাটা দু-বার ভাসল ডুবল, তারপর তলিয়ে গেল। জেঠু টেনে তুলছে—বুমবাই চিৎকার করছে, ওরে বাবা, অ অরু, দেখ এসে, জেঠু টেনে তুলতে পারছে না। বিশাল একটা মাগুর মাছ ছিপটায় আটকে গেছে। পাড়ে এনে ফেললে, কট কট করতে থাকল।

সে লাফিয়ে ধরতে গেলে বলল, পারবি না। কাঁটা মারবে। আর সে দেখল, কী অনায়াসে জেঠু মাছটার মাথা চেপে বঁড়শিটা বের করে আনল। তারপর মাথাটা মুঠো করে ধরে বালতিতে রেখে ঢাকনা দিয়ে দিল! মাছটা ভেতরে জোর লাফাচ্ছে। মনে হচ্ছিল বালতি উল্টে দেবে। বুমবাই ঢাকনাটার উপর বসে থেকে বলল, জেঠু আর ফেলতে পারবে না!

—ফলি মাছটা খুলতে পারলি?

—পারছি না।

মহাদেব দাদু এগিয়ে যাচ্ছিল—জেঠুর এক কথা—না, না, বুমবাই, মাছ ধরতে শিখতে হয়, খুলতে শিখতে হয়, রাখতে শিখতে হয়। এ-সব জীবনে দরকার। না জানলে, জীবনে একা হয়ে যেতে হয়। দেখছিস না, আমাকে—বাড়িটা ছেড়ে কোথাও গিয়ে পাঁচ দশ দিনের বেশি থাকতে পারি না!

আর একসময় বুমবাই দেখল, চুপিচুপি বড়দা ছোড়দাও ছিপ নিয়ে মাছ ধরতে বসে গেছে। এ কীরে বাবা, সব ছেলেমানুষ হয়ে গেলে! পিসিরা, বৌদিরা সবাই মজা দেখতে পুকুর পাড়ে।

বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে হচ্ছে। বড়দা ছোড়দা মাছ ধরায় এত পটু সে কখনও জানত না। জেঠুর স্ট্রোক হয়েছে শুনে হাজির। জেঠু স্ট্রোক মানতে রাজি না। ওরা খবর পেয়েছে, পনের বিশ দিন বাদে। জেঠুর এক কথা, মহাদেবটা মহা শয়তান। তারই কাজ।

বয়স হলে মানুষের অসুখ-বিসুখ বাড়বে। সামান্য মাথা ঘুরে পড়ে গেছিলাম—বেটা হৈচৈ বাধিয়ে লংকাকাণ্ড করে ছেড়েছে।

বুমবাইর মনে হলো, মহাদেব দাদু এই লংকাকাণ্ড না করলে জেঠুর বাড়ি তার আসাই হতো না। এত বড় বাড়ি, সামনের মাঠটায় শ্যালো বসিয়ে জেঠু বিঘের পর বিঘে ধান চাষ করছে। এক এক খণ্ড জমি না, যেন সবুজের সমারোহ।

বেগুন ক্ষেতে ঢুকে গেলে তার কেমন আর বের হতে ইচ্ছে হয় না। কত রকমের বেগুন হয় সে জেঠুর বাড়ি না এলে টেরই পেত না। গাছে নীল ফুল, কোনোটা ছোট, বড়, লম্বা, গোল গোল কত রকমের। ঝুড়ি নিয়ে মনসা দাদা বেছে বেছে সব তুলছে। আলুর জমি ধরে দৌড়োলে ছইয়ের ভিতর থেকে হাঁক শুনতে পায়, কারা যায়! সেই লোকটা! যে ঐ ছোট্ট ঘরটায় সারাদিন বসে থাকে। রাতেও। শীতের সকালে সে হামাগুড়ি দিয়ে বের হয়ে আসে। রোদ পোহায়। কখনও আলে আলে হাঁটে—পোকামাকড় খোঁজে। ঐ কাজই তার। আর জল দেবার সময় মেশিন চালিয়ে বসে থাকে। ভক ভক করে জল ওগলায় মেশিনটা।

বুমবাই কেমন তাজ্জব হয়ে যায়—দূরে বাদশাহী সড়ক, সেখানে উঠে গেলেই বাস, ট্রাক, রিকশা সব শহরমুখী—সেখানে ঠিক সে যেখানে থাকে, তাদের মতো সিনেমা হল, অফিস, কাছারি, কারখানা, ফুটবল, ভলিবল, ক্রিকেট, ব্যাডমিণ্টন সব হরেক রকমের মজা! এখানে এলে সিনেমা থিয়েটার ক্রিকেট সব ভুলে যেতে হয়। এ-বাড়ির মানুষগুলোর মুখে থিয়েটার বাইস্কোপ ক্রিকেটের কোনো কথা নেই। জেঠুকে সে বলেছিল, তুমি রবি শাস্ত্রীর নাম জান জেঠু?

—সে কে? মুচকি হেসে প্রশ্ন করেছিল তাকে।

—এ রাম, জেঠু রবি শাস্ত্রীর নাম জানে না!

জেঠুর এতে কোনো ভাবান্তর দেখা যায় না। জেঠুর এক কথা, লালবাহাদুর শাস্ত্রীর ছেলে বুঝি!

—ধুস, তুমি না জেঠু!

—আমি কী!

—তুমি কিচ্ছু জান না!

জেঠু বলেছিল, জেনে কী হয়? তোর রবি শাস্ত্রী জানে, এমন নিরিবিলি জায়গায় তোর জেঠু নিজের মতো বেঁচে আছে!

—ওর কী দরকার জানার!

—আমার কী দরকার!

—বা—কত বড় ক্রিকেটার!

—এই অরুণিমা, তুই জানিস রবি শাস্ত্রীর নাম!

অরু কেমন ভ্যাবাচেকা খেয়ে যায়।

জেঠুর মুখে হাসি, অরু যখন জানে না, আমার জেনে লাভ নেই।

অরুণিমা নাই জানতে পারে। মার্কিন মুল্লুকে থাকলে লোক বোকা হয়। দেশের খবর রাখে না। কত কিছু হচ্ছে, অরু জানেই না। বড়দাকেও দেখেছে, অনেক খবর রাখে না দেশের। কেমন সে এখন নিজেকে ভারি বিজ্ঞ ভাবে। কিন্তু জেঠু তার এত জানে, আর এই খবরটা রাখে না!

বুমবাই মনে মনে রেগে কাঁই। তার এত বড় প্রিয় ক্রিকেটারের নাম জানে না জেঠু! এ কীরে বাবা!

সে বলেছিল, জানো, এবারে অস্ট্রেলিয়ায় ওয়ান ডে ক্রিকেটে, চ্যাম্পিয়ন অফ দি চ্যাম্পিয়নস হয়েছে। কত দামী গাড়ি উপহার পেয়েছে।

জেঠু বলেছিল, তাই নাকি! আমি তো কোন খবর রাখি না বুমবাই!

—তুমি খবরের কাগজ পড় না?

—না।

—তবে কী পড়? এত বই বাড়িতে! তুমি কী পড়?

—কোন্ গাছে কী সার দিলে কত বড় লেবু হতে পারে বইগুলি পড়ে জানি।

বুমবাই হতবাক হয়ে যায়। সে তো ক্রিকেটের সময় সারাদিন টি-ভির সামনে থেকে নড়তেই চায় না। সে তো বিকেল হলেই ক্রিকেট খেলতে যায় পার্কে। তার ব্যাট আছে। তার টিম আছে। তার স্বপ্ন সে বড় হয়ে রবি শাস্ত্রী হবে। কিন্তু জেঠু তার নামই জানে না। জেঠুকে অবাক করে দেবার মধ্যে তার একটা আনন্দ আছে। জেঠু ছবি আঁকা পছন্দ করে। জেঠুর জন্য সে সারা বছর ছবি এঁকে খাতা ভরে রাখে। এই নিয়ে মা'র সঙ্গে বাবার মন কষাকষি। মা বলে, তোমার দাদাটি বুমবাইর মাথা খাচ্ছে। কিছু বললেই বলবে, জেঠুর জন্য ছবি আঁকছি। ডিসটার্ব করবে না। বোঝ!

আসলে সে জীবনে এমন কিছু হতে চায়, জেঠু শুনে বলবে, হ্যাঁ, বুমবাই আমাদের বংশের মুখ উজ্জ্বল করেছে।

অবশ্য সম্প্রতি সে রবি শাস্ত্রী হবে ভেবে ফেলেছে। তার নিজেরও মতি স্থির থাকে না। মৃদুলকাকা এলে যখন মুখে মুখে ছড়া বানায়, তখন মনে হয় সে বড় হয়ে মৃদুলকাকার মতো মুখে মুখে ছড়া বানাবে। আবার যখন টি-ভিতে একটি ছোট্ট সুন্দর মেয়ে রবি ঠাকুরের কবিতা আবৃত্তি করে তখন মনে করে সেও করবে। কখনও নায়ক, কখনও খেলোয়াড়, কখনও শিল্পী হতে চায়। আসলে জানেই না সে কী হতে চায়!

সে বলেছিল, জেঠু, তুমি না কিচ্ছু জানো না।

জেঠু হেসে বলেছিল, আমি যা জানি, তোর রবি শাস্ত্রী তা জানে?

তাও তো ঠিক। জেঠুর মাছ ধরা থেকে বুঝেছে, জেঠু কত পটু, জেঠুর ক্ষেত বাড়ি বাগান দেখে বুঝেছে, জেঠুর চাষ-আবাদে কত আগ্রহ। জেঠুর বড় বড় জার্সি গরুগুলি দেখে বুঝেছে, একটা গরু একাই কত দুধ যোগাতে পারে। এখানটায় সে কেমন হেরে যায়।

জেঠু কী ইচ্ছে করে এই স্বেচ্ছা নির্বাসন বেছে নিয়েছে! অথচ সে ভেবে পায় না, জেঠু কেন তার কলকাতার এত বড় বাড়ি ফেলে এমন একটা অজ পাড়াগাঁয়ে পড়ে আছে। প্রতিবেশীরা সবাই নাকি মেমবৌদিকে দেখার জন্য ভিড় করেছিল, আমাদের নুটুর বৌ। দেখি মুখখানা। নুটুর মেয়ে! এ তো ছোট্ট সরস্বতী ঠাকুরুণ!

তা ছোট্ট সরস্বতী ঠাকুরুণই বটে।

অরুর মহা উল্লাস। সে একবারও যেখানে থাকে তার কোনো খবর বুমবাইকে দেয়নি! দেবে কী, সেই আকাশ সমান উঁচু বাড়ির বিশাল ফ্ল্যাটের খবর কে জানতে চায়! অনেক উপর থেকে নিচের মানুষগুলিকে ডল পুতুলের মতো লাগে দেখতে। গাড়ি করে সকালে স্কুলে, চারটায় ফিরে আবার সেই খাঁচা। শনি রবিবারে বাবা-মা সে কোথাও দূরের বনাঞ্চলে চলে যায়। কিংবা কোন সমুদ্রের ধারে। বাবা-মা'র সঙ্গে জাঙ্গিয়া পরে সমুদ্রে স্নান—তারপর সি-বিচে লম্বা হয়ে শুয়ে থাকা। বড় একঘেয়ে জীবন। এখানে কোন নিয়ম নেই। যে যার মতো ঘুরছে-ফিরছে, খাচ্ছে—অরু ফিসফিস করে বলেছে, ড্যাডি না চুরি করে কামরাঙ্গা খাচ্ছিল!

বুমবাই অবাক!

—চুরি করে!

—হ্যাঁ। নুন দিয়ে গাছতলায় বসে বাবা আর কাকা খাচ্ছিল। আমি যেতেই মুখ মুছে উঠে দাঁড়াল।

—উঠে দাঁড়াল কেন?

বা রে, আমি খেতে চাই যদি।

—খেলে কী হবে!

—বাবা যে বারণ করেছে। টক। খেলে অসুখ করবে।

বুমবাই তক্ষুণি অরুর হাত ধরে টানতে টানতে জেঠুর ঘরের দিকে নিয়ে গেল। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, জানো জেঠু, বড়দা ছোড়দা কামরাঙ্গা খাচ্ছিল।

—ইস্, মহাজ্বালা হলো দেখছি। এত করে বলি, এসব সহ্য হবে না, তবু খাচ্ছে! স্বভাব পাল্টে গেছে। ডাক দেখি দুটোকে। খেলে জ্বর-ফর না হয়।

বুমবাই আর অরু লাফিয়ে হাজির।

—তোমাদের ডাকছে!

—কে?

—জেঠু।

—কেন? আমরা কী করেছি?

—কী করেছ জানি না! ডাকছে। বলেই অরুর হাত ধরে বেলগাছের নিচ দিয়ে ছুট লাগাল।

কিন্তু যাবে কোথায়!

জানলায় বসে জেঠু ডাকছেন, বুমবাই, অরু, শোন।

সাঁজ লেগে গেছে। সারা বাড়িটায় আলো জ্বলতেই কেমন একটা পরীদের দেশ হয়ে গেল। যেখানে যেটুকু অন্ধকার, সব সরে গেল। বিশাল সব আম-জামের গাছের ভিতর জেঠুর বাড়িটা সত্যি মিকি-মাউসের মতো দেখাচ্ছে।

বুমবাই ঘরে ঢুকে বলল, বড়দা ছোড়দা আসছে।

—তোরা বোস। সবাইকে ডাক।

বুমবাই বলল, আমরা ধানের জমিতে যাব জেঠু।

—সেখানে কেন?

—বুড়ো লোকটা বলেছিল যেতে।

—বুড়ো লোকটা মানে?

—ঐ যে ছোট্ট ঘরটায় থাকে!

—অ, হরমোহন। ওকে বুড়ো লোকটা বলছিস কেন? মোহন দাদু ডাকবি। বুড়ো লোক বলতে হয়? বুড়ো আবার কে হতে চায়! মনে কষ্ট পাবে না! ওখানে কী আছে?

—বলল, জ্যোৎস্না রাতে সে আমাদের নিয়ে ধানের জমিতে ঘুরবে!

—ঘুরবে কেন ?

—কারা নাকি সব নেমে আসে ?

—কারা ! বলেই হা হা করে হেসে উঠলেন জেঠু। ঐ সব তাঁরা ! তা তাঁরা, আমার বাবা কাকা। কেউ তো বেঁচে নেই। মোহন বলেছে, তাঁরা নাকি রাতে এই ঘরবাড়িতে নেমে আসেন। তা আসতেই পারেন। সে না হয় কাল রাতে দেখা যাবে। আমিও না হয় তোদের সঙ্গে থাকব।

তখনই বড়দা ছোড়দার গলা পাওয়া গেল, আমাদের ডেকেছেন !

—হ্যাঁ, ডেকেছি। বোস। এই বুমবাই, সবাইকে ডাক।

সবাইকে বলতে বোঝে বুমবাই, তার সব সমবয়সীদের জেঠু ডাকতে বলছে।

সে এক লাফে বের হয়ে গেল। ডাকল সবাইকে। ভিতরে এসে বলল, আসছে।

—তোর রবি শাস্ত্রীর বাবার নাম কী রে ?

সে গড়গড় করে বলে গেল। খেলার কাগজে সে রবি শাস্ত্রীর চোদ্দ পুরুষের খবর জেনেছে। বাবার নাম, দাদুর নাম সব।

সে রবি শাস্ত্রীর বাবার নাম বলল।

একে একে সবাই এসে ঘরের চারপাশের চেয়ারে বসে পড়ছে। দু'একজন পিসি, ছোট বউদি পর্যন্ত।

—রবি শাস্ত্রীর দাদুর নাম ?

বুমবাই তাও বলে দিল। সে যে কত জানে জেঠুকে বলে অবাক করে দিতে চাইছে।

জেঠু বলল, ভাল, ভাল ! বুমবাই কত জানে।

বুমবাই দেখল তার বাবাও হাজির। তার কৃতিত্বে বাবার মুখ উজ্জ্বল।

সহসা জেঠু কেন যে গম্ভীর হয়ে গেল! তারপর বলল, তোমার মাতামহের কী নাম বুমবাই!

বুমবাই ধপাস করে জলে পড়ে গেল! মাতামহ মানে জেঠুর বাবার নাম জানতে চাইছে। তার বাবা জেঠুর পিসতুতো ভাই। মাতামহের নামটা সে জানে না। এমন বে-ইজ্জত হতে হবে সে বুঝতেই পারেনি!

জেঠু বলল, রবি শাস্ত্রীর চোদ্দ গোষ্ঠীর নাম মাথায় রেখেছিস, নিজের মাতামহের নামটা আলগা হয়ে গেল!

বুমবাই এটা কত বড় অপরাধ, বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারল। বাবা কেমন যেন খুবই বড় সংকটে পড়ে গেছে!

—তুই তোর পিতামহের নাম বল দেখি।

বুমবাই সেটা অবশ্য জানে। তার কারণ, সে বড় হবার মুখে ঠাকুমা তাকে দাদুর কত সব সরস গল্প করেছে। ঠাকুরমার বারো বছর বয়সে বিয়ে। ঠাকুরদার বয়স তখন চল্লিশের উপর। দোজ বর। কুলীন বামুন। বুমবাই পিতামহের নাম বলে কিছুটা হাল্কা বোধ করল।

—নবীনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নয়, বলবি স্বর্গীয় নবীনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। মৃত ব্যক্তির আগে স্বর্গীয় কথাটা ব্যবহার করতে হয়।

অরু জেঠুর পাশে বসে আছে। জড়িয়ে। বুমবাইর খুব হিংসে হচ্ছিল। জেঠু অরুকে কোন প্রশ্ন করছে না।

এবারে সে দেখল, জেঠু অরুর দিকে তাকাচ্ছে।

অরুকে বলল, তুমি তোমার পিতামহের নাম জানো? জেঠুই যে তার পিতামহ!

অরু ঠিক বুঝতে না পারায় জেঠু চমৎকার ইংরেজিতে বলল, আই মিন ইয়োর গ্রাণ্ডফাদার।

অরু হাসতে থাকল। আসলে অরু এ-সবের কোন গুরুত্বই বোঝে না!

জেঠু এবার বড়দার দিকে তাকাল। বলল, অরু দেখছি তার উৎসের খবর রাখে না নুটু।

—না না, রাখে। মানে!

—মানে আবার কী! তোমার মেয়ে মার্কিন মুল্লুকের এত খবর রাখে আর আমার ভাল নামটা সে জানে না! আমার একমাত্র বংশধর।

—না, জানে। এই অরু, বল! হাসছিস কেন?

—দাদু নিজের নাম জানতে চায়!

আসলে অরু ভাবতেই পারে না, দাদু বলতে পারে, তার নাম কি!

—বল!

অরু দেখল বাবার মুখ কেমন পাথরের মতো শক্ত হয়ে গেছে।

অরুর কেমন কান্না পাচ্ছিল, বাবার মুখ দেখে। দরজার ওপাশে মা দাঁড়িয়ে।

বুমবাই দেখল জেঠু একে একে সবাইকে প্রশ্ন করছে। কেউ কেউ পিতামহ পর্যন্ত বলতে পারছে—তারপরই আটকে যাচ্ছে। তার পিসি পিসেমশাইরা সব জাঁদরেল সরকারি অফিসার, অথবা পাবলিক সেক্টরের কেউ ডিরেকটর, কেউ চিফ অথচ এরা কেউ পিতামহের নামের পর আর বেশিদূর কিছু জানে না। সারাক্ষণ অরুর সঙ্গে বাংলার চেয়ে ইংরাজিতেই কথা বলতে আগ্রহী। কেউ কেউ আবার বাংলাও ভাল বোঝে না। হিন্দি ছাড়া কথা বলতে পারে না। হিন্দি বাংলা মিশিয়ে কথা বলে। বুমবাইর তখন ভারি হাসি পায়।

জেঠুর প্রশ্ন সবার কাছে এবার—এদের যে দেখছি তোরা শেকড় আলগা করে দিচ্ছিস! জানিস এর পরিণতি কী ভয়াবহ! নিজের রুট কোথায় যদি না জানে তবে এরা কী হয়ে যাবে বুঝতে পারিস!

আজকাল যে শুনি স্কুল থেকেই ছেলেমেয়েরা ড্রাগ এডিকটেড হয়ে যাচ্ছে তার কারণ কী জানিস ?

সবাই চুপচাপ।

মহাদেব দাদু এসে হঠাৎ এক ধমক—তোমার এত দায় কিসের। ডাক্তার কী বলে গেছে ! কেবল সারাদিন প্যাচাল। সকাল থেকে দেখছি। এখন তো একটু শুয়ে থাকতে পার চুপচাপ।

বড়দা ছোড়দার দিকে তাকিয়ে বলল, তোমরা যাও। কেউ থাকবে না এ-ঘরে। থাকলেই বক বক করবে। বিকেলে এত করে বললাম, মাছ ধরার দরকার নেই—না—তার লাতিন এয়েছেন ! বুমবাই এয়েছেন ! মাছ ধরার কী মজা না জানলে বুঝবে কী করে, কেন একটা মানুষ এ-ভাবে একা জীবন কাটিয়ে দিতে পারে। গাছের ছায়ায় ঘুরে না বেড়াতে পারলে জানবে কী করে, কেউ না থাকলে, গাছ ফুল ফল পাখি প্রজাপতি থাকে—এদের ভিতর জীবনকে খোঁজো —আমি ছাই এ-সব কথার মাথামুণ্ডু কিছু বুঝি না বাপু। গাছগুলি নাকি, তোর বাপ কাকাদের সব আত্মা। গাছগুলি নাকি, বাপ কাকারা যে এখানে বেঁচে ছিলেন তার সাক্ষী !

বুমবাই দেখল জেঠু কেমন এক ধমকে কাবু—বললে, আমি কী প্যাচাল পাড়লাম। তুই বল বেটা তোর পিতামহের নাম কী ! এত যে তড়পাচ্ছিস আমায় উত্তর বল ! আমি প্যাচাল পাড়ি !

—জানি, বলব না !

—বলতে হবে। না বললে বুঝব বেটা তোর শেকড়ও আলগা।

মহাদেব দাদু বোধ হয় সবার সামনে হারতে রাজী না। বলল, ঈশ্বর শ্রীযুক্ত গগনচন্দ্র হালদার।

—প্রপিতামহের নাম ?

—ঈশ্বর শ্রীযুক্ত নগেনচন্দ্র হালদার।

—বৃদ্ধ প্রপিতামহের নাম ?

—ঈশ্বর শ্রীযুক্ত শরদিন্দু হালদার।

—অতি বৃদ্ধ প্রপিতামহের নাম ?

—বলব না। জানি। বকবক বন্ধ করবে কিনা বল।

জেঠু সবার দিকে তাকিয়ে বলল, মহাদেব জানে। মহাদেব একা হয়ে যায়নি। তার ছেলেরা মেয়েরা সব এক এক জায়গায়। তবু সে জানে, তার উৎস কোথায়। তোরা জানিস না।

বড়দা বলল, আমি জানব না কেন ?

—তুমি জানলেই চলবে! তোমার যেটি থাকছে, তাকে কে শেখাবে! তোমরা সব আমার কৃতী সন্তান! হ্যাঁ, এই কৃতী সন্তান! যে সে বাপ ঠাকুরদার সম্মান রাখতে জানে না! মহাদেব, এই বেটা, বলে দে, আজ আমি জলগ্রহণ করব না।

মহাদেব দাদু পড়ে গেল মহা ফাঁপরে। বলল, ওরা শেখাবে। বলল তো, শেখাবে!

—শেখাবে! দেখবি!

এবার জেঠু বড়দাকেই প্রশ্ন করল, দেখি তুমি মনে রেখেছ কিনা!

জেঠু এক এক করে বলে গেল। বড়দা মাথা গোঁজ করে উত্তর দিয়ে গেল।

জেঠু এবার ছোড়দাকে বলল, তোর মনে আছে আমাদের সাত পুরুষের নাম! অরুকে নিয়ে এটা আট পুরুষ চলেছে। বড়দাকে ফের বলল, আমার পূর্বপুরুষ কে ছিলেন, অরুকে আমি সব শিখিয়ে দেব। দেখবে, ওখানে গিয়ে ও-পাট তুলে দেবে না। মাঝে মাঝে প্রশ্ন করে জেনে নেবে মনে রেখেছে কিনা! বড়দাকে সতর্ক করে দিল জেঠু।

বড়দা বলল, তোমার নাতিন যা দুরন্ত!

—দুরন্ত হবে না, মেনিমুখো হবে তোদের মতো। চুরি করে কামরাঙ্গা খাচ্ছিলি! এত করে বলেছি, সহ্য হবে না, ধাত তোদের পাল্টে গেছে, তবু দু'ভাইয়ে চুরি করে টক কামরাঙ্গাগুলি খেলি!

—কখন কামরাঙ্গা খেলাম?

—ফের মিছে কথা!

বুমবাই দেখল বড়দা ওর দিকে কটমট করে তাকাছে। তারপর বড়দা তার বাবার দিকে তাকিয়ে বলল, একেবারে বিচ্ছু বানিয়েছ কাকা।

—বিচ্ছু হবে কেন! জানিস ও কী সুন্দর ছবি আঁকে। জেঠু তড়পে উঠল।

এরপর বুমবাইর কী যে আনন্দ—সে দৌড়োয়, সে বুঝেছে জেঠুর কথার উপর কথা নেই।

তখন সে আর অরু, সঙ্গে অপু বাবলুরা বাড়িটার চারপাশে লুকোচুরি খেলতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। আর সকালবেলায় ডেকে দেয় মহাদেব দাদু।

বুমবাই উঠেই অবাক।

কী শীত! আর তার মধ্যে জেঠু নিজে দাঁড়িয়ে সবাইকে গ্লাস এগিয়ে দিচ্ছেন আর বলছেন, খেজুরের রস, খা। শীতের সময় খেলে শরীর গরম থাকে।

বুমবাইর দাঁত কনকন করছিল। এক চুমুক খেয়ে বলল, আর খাব না।

অরু সবটা খেয়ে ফেলল। অরুর কি দাঁত কনকন করছে না! বাবলু অপুরা খাচ্ছে তেতো গেলার মতো।

জেঠুর এক কথা, যে দিনের যা, খেতে হয়। প্রকৃতি মানুষের জন্য যা যা লাগে সব তার ভাঁড়ারে মজুত করে রেখে দেয়। খেতে হয়। খেলে দীর্ঘায়ু হয় মানুষ।

কিন্তু বুমবাই ভেবে পায় না, এই বুড়ো লোকটার এত সকালে কোথা থেকে উদয়। সে ফেলেও দিতে পারে না। অরুর শীত না করলে তার শীত করবে কেন, অরুর দাঁত কনকন না করলে তার করবে কেন! সে আর বলতে পারল না, খাব না। কোনরকমে

সবটা খেতেই মনে হলো, ভারি মিষ্টি সুস্বাদু—সে বলল, আমাকে আর এক গ্লাস।

বড়দা অরুকে বলছে, তোর মাকে ডাক।

মেমবৌদি রাতে খুব ঘুমিয়েছে। এত সকালে ওঠার অভ্যাস নেই। কিন্তু বড়দা আর জেঠুর ভাল লাগার মধ্যে কিছু একটা আনন্দ খুঁজে পায় মেমবৌদি। বুমবাইর মনে হয়, যে কটা দিন এখানে থাকা, মানুষটা যা পছন্দ করে, করে যাওয়া। মেমবৌদি রস খেয়ে বলল, নাইস।

জেঠুর মুখে সে কী তৃপ্তির হাসি।

বড়দা বলল, খেজুর গাছ চেন?

মেমবৌদি মিষ্টি হেসে বলল, না!

অরুকে বলল, তুই চিনিস?

অরু বলল, না।

বুমবাই ক্ষেপে গেল, এই তোকে দেখালাম না, পুকুর পাড়ে দুটো লম্বা কাঁটায়ালা গাছ। বললাম না, খেজুর গাছ।

বড়দা বিকেলেই মেমবৌদিকে বাড়ির খেজুর গাছ দেখাতে নিয়ে গেল। বুমবাই, অরু, ছোট বৌদি, পিসিরা সঙ্গে। বুড়ো লোকটা গাছের নিচে বসে আছে। পরনে ট্যানা কানি, মাথায় ঝাঁকড়া চুল, পেট শ্রীঘটের মতো। সরু লিকলিকে হাত-পা।

বড়দা বলল, কী নাম তোমার?

—বিন্দেশ্বর।

—শীতে কষ্ট পাও দেখছি!

—তা পাই বাবু।

সবাই পুকুর পাড়ে দাঁড়িয়ে—লোকটা তরতর করে গাছ বেয়ে উপরে উঠে গেল। কোমরে ঝোলানো পাতলা হেঁসো। ছপ ছপ করে গাছের পাতলা বাখনের টুকরো খসিয়ে ফেলল কিছুটা। তারপর হাঁড়িটা পেতে রাখল। টপ টপ করে ফোঁটা ফোঁটা রস পড়ছে।

মেমবৌদির চোখে অপার বিস্ময়।

মেমবৌদি দৌড়ে বাড়ি চলে গেল। সঙ্গে বুমবাই। বুমবাইকে একটা ওভারকোট দিয়ে বলল, বুড়ো মানুষটাকে দেবে। বুমবাই কোটটা কাঁধে ফেলে ছুটে যাচ্ছে। আশ্চর্য ঘ্রাণ কোটে—সে এমন একটা কোট বড় হয়ে বানাবে ভাবল। এই কোট গায়ে দিলে, বুড়ো লোকটাকে কেমন না জানি দেখাবে। কিন্তু আরও আশ্চর্য, বুড়ো লোকটা কিছুতেই কোটটা নিল না। বলল, ও গায়ে দিয়ে বের হলে লোকে ক্ষেপাবে। তা ছাড়া ওটা কী করে পরতে হয় জানে না।

বড়দা দেখিয়ে দিল, এভাবে পরতে হয়।

বুড়োর এক কথা, ও হয় না। ও পরা যায় না। বাবু, ও গায়ে দিলে কুটকুট করবে। হাঁটতে গেলে আছাড় খাব। যাও ক'টা দিন পরমায়ু আছে, তাও যাবে।

ছোড়দা পার্স বের করে কুড়িটা টাকা দিয়ে বলল, চাদর কিনে নিও।

ছোড়দার কাছ থেকে টাকাও নিতে চাইল না।

বুমবাই দৌড়ে এসে জেঠুকে বলল, জানো জেঠু, সেই লোকটা না, ওভারকোট নিল না! জানো জেঠু, সেই লোকটা না টাকা নিল না।

জেঠু বলল, ওকে আবার কে টাকা দিতে গেল ?

—ছোড়দা।

—কী মুস্কিল। হাতে এত টাকা ও নেবে কেন। নিলেই থানায় নিয়ে যাবে। ওভারকোট পেলে তো কথাই নেই। ওর ভাই দফাদার। দু'শরিকে বনিবনা নেই। টাকার গন্ধ পেলেই, ফণিশ্বর বলবে টাকা! কোথায় পেলে!—দাও। না দিলে থানায় যাব। ব্যস, হয়ে গেল। একবার চোরের দায়ে ধরা পড়ে মার খেয়েছে। থানার নামে বিন্দেশ্বর কাবু।

বুমবাই আরও অবাক, বিন্দেশ্বর নিজেই হাজির। জেঠুকে নালিশ

দিচ্ছে, কর্তা, আমারে টাকা দেয় ক্যানে, আমারে পিরান ছায় ক্যানে! আমারে ধইরে নেইয়ে গ্যালে কী হব্বে কর্তা!

—না নেবে না। তুই যা। এই মহাদেব, একে দিয়ে দে।

মহাদেব দাদু ওকে একটা কাঠায় করে চাল ডাল নুন তেল দিয়ে বলল, বেগুন ক্ষেত থেকে তুলে নিয়ে যা।

বুমবাই ভেবে পেল না, বুড়ো লোকটা ওগুলো নিয়ে কোথায় যাবে।

জেঠু বলল, মাথায় ছিট আছে। বুড়ো হয়ে গেছে। কেউ নেই। নিজের উঠোনে সাঁজ লাগলে নাচে একা একা।

—কোথায় থাকে জেঠু?

—কাঁচা রাস্তার ও-পাশে।

বুমবাই অরুর দিকে তাকিয়ে বলল, যাবি? বুড়োর বাড়িটা দেখে আসব।

কোথা থেকে মহাদেব দাদু যেন লাফিয়ে পড়ল, কোথায় যাবে! বিন্দার কাছে! খবরদার। যাবে না। ও কাগা নেত্য বগা নেত্য দেখালে ঘোর লাগবে চোখে। ছাগল গরু ভেড়া বানিয়ে রাখবে, তখন আমরা তোমাদের খুঁজে পাব না। বেটা পারে না হেন কাজ নেই।

জেঠু কোন কথা বলছে না। বারান্দার ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিয়েছে। বুমবাই জেঠুর পরামর্শ চায়। মহাদেব দাদু ভয় ধরিয়ে দিয়েছে। কিন্তু লোকটার লম্বা নাক, ছোট্ট থুতনিতে ক' গাছা সাদা দাড়ি, বকের মতো হেঁটে যাওয়া, সবটাই রহস্য। কাগা নেত্য বগা নেত্য কী ঠিক বুঝল না। ভূতের ওঝা-টোজা হবে। চুল খাড়া, শরীরে খড়ি ওঠা, প্রায় যেন জ্যান্ত ভূতের সামিল—কিন্তু লোকটা তাকে যাবার সময় যে বলে গেল, তারা সবাই গেলে, সে সীতাহরণের পালা গাইবে।

বুমবাই যেই দেখল, মহাদেব দাদু কাছে নেই অমনি জেঠুর

কানের কাছে ফিসফিস গলায় বলল, জেঠু, কাগা নেত্য বগা নেত্য কী!

জেঠু হেসেছিল। বলল, বিন্দা নাচে। একা থাকলে নাচে। লোক দেখলে নাচে। মোগা নাচ। ওটা এক ধরনের লোকনৃত্য। লোকনৃত্য বুঝিস!

বুমবাই বলল, নাচে মানে?

—লোকনৃত্য বুঝিস কিনা বল!

বিষয়টা ঠিক তার বোধগম্য হলো না! সে ক্রিকেট, ছবি আঁকা ছাড়া কিছু বোঝে না। সে বলল, কাগা নেত্য কী বল না জেঠু!

—কাক সেজে নাচে।

—লোকটা কাক সাজতে পারে?

—মুখোশ আছে। কাকের মুখোশ, বকের মুখোশ পরে নেয়। তারপর আপন মনে নাচে।

—নাচে কেন?

—কী করবে। সারাদিন ওর এখন আমার বাড়িতে ঐ একটা কাজই আছে। লোকজন বাড়ির পাশ দিয়ে বড় কেউ তার যায় না। বাড়িটা ওর ধানের গোলার মতো। ঘুলঘুলি আছে। ঘুলঘুলি দিয়ে ভিতরে ঢুকে যায় রাতে। চারপাশে উঠোন। সেই উঠোনে সে নাচে।

—ওর নাচ দেখেছ?

—দেখব না! অতিষ্ঠ করে মারে। মহাদেবের ভয়ে কাক বক সেজে আর আসে না। আসে না ঠিক না, আসে। ফাঁক বুঝে আসে। মহাদেব বাড়ি নেই, কোথাও গেছে শুনলে গুঁড়ি মেরে জঙ্গল থেকে বের হয়ে আসে!

বুমবাইর কী যে হয়! সে আর মুহূর্ত মাত্র অপেক্ষা করল না। দৌড়ে ভেতর বাড়ির দিকে ঢুকে গেল। পা-টা বড় চুলকাচ্ছে। বসে

পা চুলকে নিল। আর এদিক ওদিক খুঁজছে। অরুণিমাকে পেয়ে গেল গোয়াল বাড়ির পেছনে। অরুণিমা অপু কোঁচড়ে গাঁদা ফুল নিয়ে মালা গাঁথছে। সে ডাকল, শোন অরু।

অরু কাছে গেলে বলল, যাবি ?

—কোথায় !

—নাচ দেখতে যাব। সবাই যখন দুপুরে দিবানিদ্রা, বুঝলি না, ভোঁস ভোঁস—বলে নাক টেনে চিৎপাত হয়ে পড়ে বিষয়টা বোঝাতেই অরু হেসে গড়িয়ে পড়ল। আংকল, তুমি একটা জোকার।

—ঠিক আছে, শোন। এদিকে আয় অপু। আমরা একটা জায়গায় যাব। মহাদেব দাদু জানবে না। চুপিচুপি। মনে থাকবে তো ! কেউ জানবে না। জানলে যেতে দেবে না।

বুমবাই এই জেঠুর দেশে এসে কত কিছু দেখে গেল, শহরে গিয়ে মাকে বলতে না পারলে স্বস্তি পাবে না। এমন ভাবে বলবে, যাতে মা নিজেই পুজোর ছুটিতে জেঠুর দেশ-বাড়ি দেখার জন্য পাগল হয়ে ওঠে। এত কাছে একটা লোক মুখোশ পরে নাচে, রাম রাবণের সাজে, অশোক বনে সীতা, মন্দোদরীর মন্দ কপাল, আবাগির বেটি আমার মা সীতা জননী, আরও সব নানা রকমের গান গলায় থাকে। কেউ নাচ দেখতে চায় না। কারণ নাচ দেখিয়ে হাত পাতার অভ্যাস। এক দু-পয়সা। তার বেশি নেয় না। তবে বয়েস হলে যা হয়, বেশিদূর হেঁটে যেতে পারে না—কাছাকাছি তেমন বাড়িঘরও নেই, নিজেই একা নাচে। খাওয়া-পরার দায় জেঠুর। এখন সে নির্ভাবনায় নাচতে পারে। কর্তার বাড়িতে নাচতে পারে না। একবার নাচ শুরু করলে শেষ করতে চায় না। মহাদেব দাদু লাঠি নিয়ে তখন তেড়ে যায়। কোমরে খেজুরের ডাল দিয়ে পুচ্ছ বানায়, যখন দৌড়োয়, পুচ্ছ সব খসে পড়ে।

বুমবাই নিজেই হা হা করে হেসে উঠেছিল—জেঠুর কাছ থেকে সব শোনার পর।

এমন একটা মজার দেশে এসে কাগা বগার নেত্য না দেখে যায় কী করে! অরুটাও তার স্কুলের বন্ধুদের বলতে পারবে, একটা লোক পাখি সেজে নাচছিল। কী সোন্দর নাচ! অরু এখনও সুন্দর বলতে পারে না। কেবল সোন্দর বলে। বুমবাইর এটা বড় একটা আফশোস থেকে গেল।

বুমবাই বলল, আমি বকুলগাছটার নিচে বসে কুক কুক শব্দ করব।

—কখন!

—মহাদেব দাদুর দিবানিদ্রার সময়।

আসলে এখানে আসার পর সবাই খোলামেলা, পিসি বৌদি সবাই। একটা ভয় ছিল, সাপখোপের। শীতের সময় বলে তারও ভয় নেই। জেঠু বলে দিয়েছে, ক'টা দিন ওদের মতো থাকতে দাও। বেশি শাসন ভাল না। এতে শিশুদের আত্মনির্ভরতা কমে যায়। দেখুক সব। নিজের চোখে দেখুক। বাবা কাকারা, বড়দা ছোড়দা, বৌদি পিসিরা নিজেরা নানা জায়গায় চলে যাচ্ছে। বড়দার গাড়ি, তায় ড্রাইভার, যখন তখন হুসহাস সবাই বের হয়ে পড়ছে—এ এক আনন্দ যদিও—যেন সবাই স্বাধীন। বুমবাইদের মতো ছোট যারা আছে, তাদের দেখার দায়িত্ব মহাদেব দাদুর। আর কেউ কোন খোঁজখবর রাখতে সাহস পায় না। অরু কোথায় একবার বলতেই জেঠু বলেছিল, তুমি দেখছি নুটু অরু ছাড়া পৃথিবীতে কিছু বোঝ না। একটু হাত-পা মেলে ঘুরে বেড়াক। সব সময় মেয়েটার তুই পিছু লেগে থাকিস!

জেঠুর ভয়ে কেউ বেশি ডাকাডাকি করতে সাহস পায় না। জেঠুর এক কথা, প্রকৃতিই সব শিখিয়ে দেয়। কখন ঘরে ফিরতে হয় বলে দেয়। কখন কী তার দরকার বুঝিয়ে দেয়। আমরা প্রকৃতি থেকে দূরে সরে গেছি বলে, বড় অল্প আঘাতেই হায় হায় করে উঠি।

সুতরাং এই কথা থাকল।—কুক কুক।

মনে থাকবে।

অপু দীপু বাবলু অরু সবাই গোল হয়ে দাঁড়িয়ে। গোয়াল বাড়ির পেছনে গম্ভীর কথাবার্তা বুমবাইর। বুমবাই একবার অরুর দিকে তাকিয়ে বলল, তোকে নেব না ভাবছি!

—কেন্নু কেন্নু ?

—এই কেন্নু কেন্নুর জন্য। কেন হবে। বল সুন্দর।

অরু বলল, সুন্দর।

—আবার বল সুন্দর।

অরু বলল, সুন্দর।

দশবার বল। একবার ভুল হলেই নেব না। আর আশ্চর্য অরু ঠিক দশবারই সুন্দর উচ্চারণ করল।

শীতের দুপুরে বুমবাই সহসা দেখল গাছের ডালে কী একটা ঝাঁপাঝাঁপি শুরু করেছে। বিশাল গাব গাছ, গভীর অন্ধকার ডালপালার জঙ্গলে। বাড়ির পেছনে গাছটা। ওর কেমন ভয় ধরে গেল। কিন্তু সে ভয় পেলে অরু ভয় পাবে, অপু ভয় পাবে। সবাই ভয় পাবে। ভয় পেলে তাকে এরা মানবে কেন! জেঠু বলেছে, ভয় পেতে নেই। ভয় পাবার আগে দেখবে ভয়টা কিসের। বুমবাই কাউকে ভয় পায় না। ভূত ছাড়া ভয় পাবার মতো আর কী আছে জানে না। ভূতের সঙ্গে তো আর মারামারি করা যায় না। রাতে সে একা বের হতে ভয় পায়। দিনের বেলাতেও কোন ফাঁকা জায়গায় একা সে যেতে পারে না। কিন্তু এখানে আসার পর সে ফাঁকা জায়গা পেলেই ছুটতে চায়। কারণ জেঠু বলেছে, ভূত বলে কিছু নেই। থাকতে পারে না। সব মনের বিকার থেকে হয়।

এ-সব সাত পাঁচ ভাবতেই দেখল একটা লেজ ঝুলছে। ভূতের আর যাই থাক, লেজ থাকবে বিশ্বাস করতে পারে না। তারপর দেখল বিশাল একটা বাঁদর গাছ থেকে লাফ মেরে মাঠের উপর দিয়ে

ছুটে গেল। সবাই ভয়ে কাঁটা। এখানে আসা তক কেউ এ জীবটিকে দেখেনি! সে চিৎকার করে ডাকল, জেঠু, হনুমান!

জেঠুর সাড়া পাওয়া গেল না। মহাদেব দাদু ছুটে এসেছে।

—কী হলো!

—হনুমান।

মহাদেব দাদুর এক কথা, তুমি হনুমান। হনুমান না হলে এই দুপুরে কেউ টো টো করে ঘুরে বেড়ায়।

অরু বলল, মাংকি!

মহাদেব দাদু মাংকি শুনে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠল। কী সব বিশ্রী কথা, মাংকি কী আবার।

বুমবাই বুঝতে পারে মহাদেব দাদু রেগে গেলে সারাক্ষণ পিছু নেবে তাদের। মাংকি বুঝতে না পারলে ভাববে ঠাট্টা করা হচ্ছে। সে বলল, হনুমানের ইংরাজি মাংকি!

—ও-সব আমি বুঝি। আমাকে বোঝাতে হবে না। সব বাড়ি চল।

অরু বুমবাইর দিকে তাকাল।

বুমবাই বলল, তবে ঐ কথা থাকল।

মহাদেব দাদু বুঝতে পারল না, কি কথা থাকল তাদের!

শীতের বেলা পড়ে আসে।

কেমন গাছপালা সব নিঝুম। বাড়িটা থেকে তারা বেশ দূরে চলে এসেছে। ও-দিকে জেঠুর ধানের জমি, শ্যালো বন্ধ এখন। একটা সড়ক চলে গেছে পাকা রাস্তার দিকে। বাঁ-দিকে নাবাল জমি। চাষ-আবাদ হয় না। খড়ের বন। বনের ভিতর দিয়ে হেঁটে যাবার একটা রাস্তা খুঁজে পাওয়া গেল। বুমবাইর মনে হলো, এই রাস্তা ধরে গেলেই বিন্দেশ্বরের বাড়ি সোজা উঠে যাওয়া যাবে।

একটা খটকা মনের মধ্যে উঁকি দিল বুমবাইর। কাঁচা রাস্তা তো

এটাই। কিন্তু এখানে কোন বাড়িঘরই নেই। মানুষ জন নেই। শুধু দেখল এক পাল হনুমান কলাইর জমিতে বসে কচি ডগা ছিঁড়ে খাচ্ছে। মাঝে মাঝে শীতের পাখির ঝাঁক উড়ে যাচ্ছিল। কোথাও জঙ্গলের মধ্যে ছাতার পাখি কিচিরমিচির করছে। সাদা বকের ঝাঁক উড়ে এসে বসল পাশের জলাটায়। আর মাথার উপর কী বিশাল আকাশ। শীতের এক আশ্চর্য উষ্ণতা থাকে এ-সময়—বুমবাইর ভয় পেলে চলবে না, এদিক ওদিক চেয়ে বলল, কাগা বগার নেত্য দেখতে হলে এ-পথটাতেই ঢুকতে হবে। তোরা ভয় পাবি না তো ?

অপু বলল, কী জঙ্গল !

বাবলু বলল, বুমবাইদা, তুমি ঠিক জানো তো···

বুমবাই তো আর না জেনে ছোট হতে পারে না ! সে বলল, আলবৎ জানি। বুমবাই কত সব দুঃসাহসিক অভিযানের কথা গল্পের বইয়ে পড়েছে। সেই যে এক ম্যাণ্ডেলার গল্প জেঠু তাকে বলেছিলেন, সেই গল্পটার কথাও তার মনে পড়ে গেল। কত রাতে ম্যাণ্ডেলার কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়েছে। সেই কোন্ এক পাহাড়ি উপত্যকায় ম্যাণ্ডেলা আর তার মা থাকে। ম্যাণ্ডেলার বাবা জাহাজডুবিতে নিখোঁজ। উপত্যকা থেকে নেমে সমুদ্রের বালিয়াড়িতে এসে ম্যাণ্ডেলা দাঁড়িয়ে থাকত, যদি বাবার জাহাজ ফিরে আসে ! দিন যায়, আসে না।

জেঠুর গল্পে ঐ এক মজা, দিন যায় আসে না বলেই চুপ মেরে যায়।

—তারপর কী জেঠু !

—তারপর আর কী। মানুষের আশা তো অপূর্ণ থাকে না। ম্যাণ্ডেলা রোজ ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করত, বাবা কেন আসে না। আমাদের বাবা ছাড়া আর কেউ নেই !

বুমবাইর ছবি আঁকা বন্ধ হয়ে যায়। জেঠুর পায়ের কাছে গুঁড়ি

মেরে উঠে আসত। প্রশ্ন করত, ম্যাণ্ডেলার বাবা ফিরে এসেছিল? বাবা না থাকলে কেউ থাকে না, ম্যাণ্ডেলার জন্য ওর ভারি কষ্ট হতো! সে চাইত, ম্যাণ্ডেলার বাবা ফিরে আসুক।

জেঠু তখন বলত, ওর বাবা ফিরে এসেছিল কিনা জানি না। আমাদের জাহাজ তো বন্দরে দু একমাসের বেশি নোঙর ফেলে থাকতে পারত না। কত দেশে যেতে হবে। কত মালপত্র জাহাজে। তবে শুনেছি, ম্যাণ্ডেলাকে একটা পালক দিয়ে গেছিল।

—কে দিল পালকটা?

—এক ভারতীয় জাদুকর। নাম জাদুকর বসন্তনিবাস। একটা পালক আর রুপোর ঘণ্টা।

—রুপোর ঘণ্টা কেন?

—ম্যাণ্ডেলার একটা পোষা বাচ্চা ক্যাঙ্গারু ছিল। নাম হাইতিতি। পালকটা চুলে গুঁজে দিলেই ম্যাণ্ডেলা অদৃশ্য হয়ে যেতে পারত। যেখানে খুশি উড়ে যেতে পারত। সঙ্গে থাকত হাইতিতি। ওর গলায় রুপোর ঘণ্টা বাজত ঢং ঢং। উপত্যকার মানুষেরা আকাশে ঘণ্টাধ্বনি শুনলেই বুঝতে পারত সেই মেয়েটা আকাশে ভেসে চলে যাচ্ছে। বাবার খোঁজে সে যেখানে যত দ্বীপ আছে উড়ে যেত, যেখানে যত দেশ আছে সে উড়ে যেত।

জেঠুর কাছে এমন গল্প শোনার পর, সে নিজেও কতদিন স্বপ্ন দেখেছে, একটা পালক তার শিয়রে কে রেখে গেছে। পালকটা পরে সেও উড়ে যাচ্ছে ভিন্ন গ্রহে। সঙ্গে ম্যাণ্ডেলা আর হাইতিতি।

খড়ের বনে ঢুকে গিয়ে আজ বুমবাইর মনে হলো, সেই ম্যাণ্ডেলাই তার সঙ্গে আছে। অরুকে দেখার পর বারবারই মনে হয়েছে, উপত্যকার সেই মেয়েটি। যেন বাচ্চা পরী।

খড়ের বনে ওরা সেই সরু পথ ধরে হেঁটে যেতে থাকল। ওদের দেখা যাচ্ছে না। ওরাও বাইরের কিছু আর দেখতে পাচ্ছে না। ঘাসের জঙ্গল এত উঁচু যে এক চিলতে আকাশ বাদে আর কিছু

তাদের চোখে পড়ছে না। বুমবাই ভয় পেয়ে গেলে সবাই ভয় পেয়ে যাবে। তবে সে ভয় পাচ্ছে না। সঙ্গে যে আজ তার সত্যিকারের ম্যাণ্ডেলা রয়েছে। সে অরুর দিকে তাকিয়ে বলল, এই অরু, ভয় করছে না তো!

—না আংকল, একদম ভয় করছে না!

তখনই অপু নাক টেনে বলল, ওফ, কী গন্ধ রে বাবা!

বুমবাইও গন্ধটা পাচ্ছে। বিশ্রী গন্ধ! জন্তুজানোয়ারের গায়ের গন্ধের মতো। সার্কাসে বাঘের খাঁচার কাছে গেলে বুমবাই একবার নাক কুঁচকালে বাবা বলেছিল, বাঘের গায়ের গন্ধ। শিকারীরা এই গন্ধ শুঁকে টের পায় কাছে কোথায় তেনারা আছেন।

বুমবাই জানে, জেঠুর পৃথিবীতে খরগোশ, কাঠবেড়ালী, ভোঁদড়, শেয়াল আছে, আজ হনুমানের পালও দেখতে পেল। বাঘ আছে বলে তো জানে না। বাঘ থাকলে জেঠু ঠিক বলত। তবু কেন যে ভয় করছে।

আফ্রিকার জঙ্গলে এমনি ঘাসের বনে শুনেছে বাঘেরা থাকে—সুন্দরবনের বাঘেরাও ঘাসের জঙ্গলে লুকিয়ে থাকে। এখন যে দৌড়ে পালাবে তারও উপায় নেই। ঘাসের জঙ্গলে জন্তুজানোয়ারের চলাফেরার রাস্তা থাকে। মনে হয় মানুষের চলাফেরার রাস্তা—কোন একটা বইয়ে সে এমনও পড়েছে। এই রাস্তা এখানে সেখানে বেঁকে গেছে—আবার সামনে আর একটা এমন রাস্তা, গোলকধাঁধার মতো, কোন্‌দিকে দৌড়ে গেলে কাঁচা রাস্তায় উঠে যাবে, জেঠুর ধানের জমি দেখতে পাবে বুঝতে পারছে না।

কিন্তু জেঠু বলেছে বিপদে দিশেহারা হতে নেই। মানুষ সব পারে। বাঘকেও মানুষ আজকাল পোষে। 'বর্ন ফ্রি' ছবি সিনেমাতে দেখেছে। আফ্রিকার জঙ্গল দেখেছে। ওড়িশার জঙ্গলের খইরিকে নিয়ে কত ছবি বের হয়েছে কাগজে। দিশেহারা সে হবে কেন! বলল, পচা গন্ধ। ও কিছু না। কোথায় কি মরে পড়ে আছে কে জানে! শীগগির পা চালিয়ে হাঁট।

তারপরই হাঁকল, ও বিন্দেশ্বর, তোমার বাড়িটা কোথায় ?

আর তখন জঙ্গলের ভেতর কোথা থেকে বের হয়ে এল বিন্দেশ্বর। একেবারে একটা কাকলাসের মতো মাথা বের করে বলল, বাবুসকল, আমি আপনাগ পিছু পিছু হাঁটতাছি।

বুমবাইর দম বন্ধ হবার মতো অবস্থা। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। কোথায় কত দূরে চলে এসেছে সবাইকে নিয়ে বুঝতে পারছিল না। সবাই যে হাউমাউ করে কান্না জুড়ে দেয়নি সেটাই রক্ষা। বিন্দেশ্বর নেংটি পরে কখন পিছু নিয়েছে জানে না। উপরে নিচে গোনাগুনতি তিনটে দাঁত মুখে। আর সব দাঁত ইঁদুরে খেয়ে নিয়েছে তার। তাকে ডাকতেই সে হাজির। বিন্দেশ্বর কি আসলে সেই যাদুকর বসন্তনিবাস ! জেঠু কি বসন্তনিবাসকে সঙ্গে নিয়ে দেশে ফিরেছিল। বসন্তনিবাসকে কি জেঠু এই জঙ্গলের মধ্যে বিন্দা বানিয়ে রেখেছে। জেঠু জাহাজে কাজ করত এক সময়। কত দেশ ঘুরেছে, কত বিচিত্র মানুষের গল্প বলেছে। বসন্তনিবাস নাকি জেঠুর জাহাজেই কাজ করত। জাহাজ বন্দরে নোঙর ফেললে বসন্তনিবাস পরত একটা আলখাল্লা, পায়ে সোনালী নাগরা, মাথায় পরত পালকের টুপি, আলখাল্লার লম্বা পকেটে থাকত হরেক দেশের আজব খেলনা। একটা বেড়ালের ছানা পকেট থেকে সব সময় উঁকি মেরে থাকত। জাহাজ থেকে নামলেই বন্দরে সব শিশুরা জড় হতো তার চারপাশে। সে তাদের হাতে টফি দিত। প্লাস্টিকের খেলনা দিত, যে যা হাত পেতে চাইত সবই পেয়ে যেত।

বিন্দাও যেন তেমনি। কী করে টের পেয়েছে তারা। খড়ের বনে হারিয়ে গেছে, এটা কোন জাদুবিদ্যা জানা থাকলেই সম্ভব। বিন্দাকে দেখে সে কেমন হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে। সে যে ভয় পেয়ে গেছিল বলল না। সে যে রাস্তা হারিয়ে ফেলেছিল বলল না। একেবারে লায়েক ছেলের মতো বলল, তোমার বাড়িটা কোন্‌দিকে ? তুমি যে বলে এলে কাগা বগার নেত্য দেখাবে—আমরা বাড়ি থেকে পালিয়ে চলে এসেছি।

—বাবুসকল, কী দয়া আপনাগ। বড় ভালবাসেন দেখছি বিন্দাকে। আপনার জেঠার বান্দা আমি। সারাদিন নেত্য দেখাব বলে ঠিক করে রেখেছি। রঙ গুলে রেখেছি, শোলার মুখোশ বানিয়েছি। আপনারা ক'জনা ?

বুমবাই গুনে বলল, আমরা সাতজন।

বিন্দা বলল, হয়ে যাবে।

বকের মতো ঠ্যাং ফেলে সে হাঁটছে। আর রাজ্যের সব আজগুবি কথা। সে বলল, আপনার জেঠাবাবু বিশ্বাস করে না বনটায় বাঘ আছে ?

—এখানে বাঘ ?

—বাঘের কি দোষ বলেন, খেতে না পেলে গাঁয়ে গেরামে উঠে আসবে। তবে কারো অনিষ্ট করে না। পোষা বাঘ। বলেই সে হাতে তালি বাজাল। আর দেখল, একটা বাঘের বাচ্চা ওর পায়ে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। বলল, সারা দিনরাত এরাই আমার বাবুসকল সঙ্গী।

তারপর বলল, এই পেরনাম কর।

ছোট্ট বাচ্চা বাঘটা দু'পায়ে খাড়া হয়ে গেল। হাত জোড় করল।

বাঘের বাচ্চাটার গা' থেকে বোটকা গন্ধ বের হচ্ছে। বিন্দার পায়ে পায়ে তবে বাঘটাও আসছিল! জেঠু বলত, বসন্তনিবাসের কাণ্ডই ছিল অদ্ভুত। চোখে দেখিনি। তবে শুনেছি, বন্দরে বসন্তনিবাস ইচ্ছে করলে বেড়ালটাকে বাঘ বানিয়ে ফেলতে পারত। জাদুকররা পারে না হেন নাকি কাজ নেই!

বিন্দাই তবে বসন্তনিবাস! বুমবাই কেমন অবাক চোখে দেখতে থাকল বিন্দাকে।

বিন্দা বলল, কী আনন্দ! কী আনন্দ! কাগা বগার নেত্য দেখতে এয়েছেন আমার বাবুসকলেরা। পরীদিদি, ডর লাগছে না তো!

অরু বলল, না না। তুমি তো দাদুর খেজুর গাছ কেটে মিষ্টি রস বের কর। এত বড় একটা গাছ থেকে ফোঁটা ফোঁটা মধুর রস বের করা জাদুকরের পক্ষেই সম্ভব।

একবার যেতে যেতে বুমবাইর ইচ্ছে হলো বলে, বসন্তনিবাস, তুমি কি বলতে পার, ম্যাণ্ডেলা তার বাবার খোঁজ পেয়েছিল কিনা? তুমি যে তাকে একটা পালক দিয়ে এসেছিলে! হাইতিতিকে রুপোর ঘণ্টা!

বিন্দা বলল, কত পালক আছে দেখবেন। সব জড় করে রেইখে দিইছি। বাবুরা আসবেন—কী আনন্দ, কী আনন্দ! গা'ছের ডালে বইসে আছি, ছাখি বাবুসকল খড়ের বনে ঢুইকে গ্যাল। কী আনন্দ, কী আনন্দ!

বিন্দার বাড়িতে পালকও আছে। বুমবাই ভাবল সে একটা পালক চেয়ে নেবে। সে কেন, সবাই। ম্যাণ্ডেলার মতো সেও যে আকাশে কত রাতে স্বপ্নে উড়ে গেছে! ভেসে গেছে! বাতাসে ভেসে যাওয়ার মজাই আলাদা। পালকের কথা ভাবতেই বিন্দা ঠিক টের পেয়ে গেল একটা পালক চাই তার।

বিন্দা ঝোপ-জঙ্গল ভেঙে পথ করে দিচ্ছে। গাছের ডাল, কাঁটাঝোপ, ফণি মনসার জঙ্গল পার হয়ে আর একটা জঙ্গলে ঢুকে অবাক। সবুজ ঘাস আর মাঠের মতো। কোন বাড়িঘর নেই। পাশেই বড় বিল। লাল শালুক ফুলে বিলের জল রঙিন হয়ে আছে। বিলের পাড়ে দু'তিনটে বড় কাঠের বাক্স। অনেক দূরে শহর থেকে পাকা সড়ক চলে গেছে।

অরু বলল, এটা তোমার বাড়ি? ঘর কই?

বুমবাই বলল, এ তুমি আমাদের কোথায় নিয়ে এলে!

বাঘের বাচ্চাটা লাফাচ্ছে। একলাফে কাঠের বাক্সের উপরে গিয়ে বসে পড়ল। কোথা থেকে দুটো হনুমান, একটা বেজি উঠে এল।—এ কেমন লোক রে বাবা! বুমবাই অপুরা কেমন দিশেহারা!

একদিকে শালগাছের জঙ্গল। বড বড় শালগাছ। নিরন্তর পাতা ঝরছে। বাক্সতে কী আছে কে জানে! মহাদেব দাদু বলেছে, বেটা সব পারে। মানুষকে গরু ছাগল বানিয়ে রাখতে পারে। বুমবাইর মনটা খচখচ করছে। বিন্দা কী বুঝতে পেরে বলল, আমি নাচি, আমার আর কোন দোষ নাই বাবুসকল। বলেই তিড়িং করে লাফিয়ে উঠল। সাঁজ লেগে গেছে। বাড়িতে খোঁজাখুঁজি শুরু হবে। কিন্তু এমন একটা অচেনা জায়গা থেকে তারা যাবেই বা কী করে!

আরে এ তো আরও বিস্ময়। সব বুঝতে পারে বিন্দা। বলল, ডর নাই বাবুসকল। আমরা নাচতে নাচতে বাবুর মহল্লায় চলে যাব। আমার বাপ ঠাকুরদার ইজ্জত আছে না! আমি কোন আকাম কুকাম জানি না বাবুসকল। বলেই সে কাঠের তাপ্পি মারা বাক্স দুটো খুলে ফেলল। বলল, বাড়ি থাকলে মহাদেব বেটা তাড়া করবে, এইখানে চইলে এলাম। ছাখেন। বলেই সে একটা মুখোশ বের করে পরীদির মুখে লাগিয়ে দিল। লাগাতেই পরীদি মানে অরু ময়না পাখি হয়ে গেল। বের করছে সব টেনে টেনে। একটা জোব্বার মতো কী বের করে পরে ফেলল বিন্দা। চকচকে রাংতা লাগানো। জোনাকি পোকা আঠা দিয়ে গাঁথা। জোনাকি পোকাগুলি ওড়ার জন্য ছটফট করছে। আর আগুনের ফুলকির মতো জ্বলে উঠছে। সে বাক্স থেকে আবার কী টেনে বের করতেই দেখল—বিশাল একটা ধামসা। গলায় ঝুলিয়ে দুটো কাঠি দিয়ে এমন তালমিলেব বাছি শুরু করল যে পরীদি নাচতে শুরু করে দিল। পরীদি ময়না পাখি, বিন্দার মুখে দৈত্যের মুখোশ, দুটো দাঁত বের হয়ে আছে। কেমন মোহের মধ্যে পড়ে গেছে বুমবাই। বুমবাই কেন, সকলেই।

একটা আজব দেশের বাসিন্দা হয়ে গেলে যা হয়—স্বপ্নে এমন আজব দেশ ঘুরে এসেছে সবাই। এটা স্বপ্ন কি না, তাও বুঝতে

পারছে না যেন অপু বাবলুরা। ওরা বলল, আমাদের মুখোশ কই। কেবল তুমি আর অরু নাচবে, হবে কেন ?

গলায় ঝোলানো ধামসা। হাতে দুটো কাঠি। এই কাঠিতে কী আশ্চর্য জাদু, বিন্দা কত রকমের বোল তুলছে কাঠিতে।

বুমবাই বলল, আমি কি সাজব ?

বিন্দা বাদ্য থামিয়ে বলল, সাজেন। সে হাঁটু মুড়ে বসে গেল। বলল, শালপাতা তুলে আনেন। বুমবাই ছুটে গেল শালপাতা কুড়োতে। জড় করে ফেলল গাদা গাদা শালপাতা। শালপাতা দিয়ে বিন্দা কী করবে জানে না। কিন্তু এমন ঘোর লেগে গেছে যে প্রশ্ন করার মতোও বিচারবুদ্ধি নেই কারো।

বিন্দার কাজ করতে অসুবিধা হচ্ছিল। মুখোশটা খুলে পাশে রেখে দিল। নারকেল পাতার কাঠি বের করল গুচ্ছের। তারপর শালপাতা সেলাই করতে বসল। নিমেষে বুমবাইর মাপের শাল-পাতার একটা পোশাক বানিয়ে ফেলল। পোশাকটা পরতেই মনে হলো শরীর কেমন খসখস করছে। পাতার ঘষটানির শব্দ। হাত মেলে দিলে ঈগলের মতো পাখনা হয়ে যাচ্ছে। পেছনে ঝুলছে শালপাতার পুচ্ছ। আসলে বিন্দা যে শুধু জাদুকরই নয়, ওস্তাদ কারিগর, বুমবাই এই প্রথম টের পেল। কত সব সুন্দর মুখোশ বাক্সের মধ্যে। খালি শোলার মণ্ড দিয়ে তৈরি। বুমবাই ঈগল পাখির মতো ডানা মেলে দৌড়াচ্ছে। অরুর গায়ে সবুজ রঙের ফ্রক। পায়ে সবুজ মোজা। ময়না পাখির মুখোশ পরে সেও চঞ্চল হয়ে উঠেছে। বাবলু অপুরা বলছে, আমাকে আগে, আমাকে কী সাজতে হবে। একে একে বিন্দা সবাইকে একটা করে মুখোশ দিয়ে দিল। পাতার পোশাক বানিয়ে দিল। সে এবারে চায় সত্যিকারের মোগা নৃত্য কারে বলে মানুষজন দেখুক। বেটা মহাদেব দেখুক। তার ধামসা আবার গলায় ঝুলিয়ে ড্রিম ড্রিম বাজনা শুরু করে দিতেই নাচ শুরু হয়ে গেল। হেলে দুলে নাচছে। কা কা করছে কেউ।

কেচরমেচর করছে কেউ। যেন দৈত্যটা একদল প্রকৃতির জীব নিয়ে রাস্তায় উঠে যাবে।

তখন রাত হয়ে গেছে। চনমনে জ্যোৎস্না। মহাদেব এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বলছে, কর্তা, বেটা ভেগেছে। এত করে বললাম বদমাশটাকে আশকারা দেবেন না, এখন কী হবে!

বুমবাইর বাবা, বড়দা, ছোড়দা, পিসি জেঠি কাকিরা কান্নাকাটি শুরু করে দেবে আর কি!

মহাদেব বলল, আমি থানায় যাচ্ছি। বেটার মোগা নাচ বের করছি। বেটা পারে না হেন কাজ নেই। তুকতাক জানে। না'লে কখনও হয়, বনবিড়াল, নিশাচর জীব এখন বিন্দার বাড়ি পাহারা দেয়। গিয়ে দেখলাম কেউ নেই। হনুমান দুটোও নেই। বেজিটাও নেই। গোলার মধ্যে কাঠের বাক্স দুটো ছিল, তাও নেই।

কর্তা কী বলবে বুঝতে পারছেন না। কোথায় গেল! বিন্দা কি একটা আলাদা পৃথিবীর স্বপ্ন দেখত! বাপ পিতামহের ঐতিহ্য রক্ষায় সে কী ওদের নিয়ে দূরের পাহাড়ে চলে যেতে চায়। বুমবাইর জেঠু শুধু বলল, বিন্দা কোন খারাপ কাজ করতে পারে বিশ্বাস হয় না। সে শিশুদের ভালবাসে। শিশুদের সে কোন অনিষ্ট করতে পারে না।

মহাদেব খেঁকিয়ে উঠল, আপনার ঐ এক কথা। ও পারে না হেন কাজ নেই। বেটা ডাকিনী বিদ্যা যোগিনী বিদ্যা সব জানে। না'লে একটা বনবেড়াল বাড়ি পাহারা দেয়। কে কবে এমন অনাসৃষ্টি কারবার দেখেছে!

কর্তা বললেন, ওটা তো বন থেকে সে কুড়িয়ে এনেছে। বাচ্চা ছিল। ওর কাছে থাকতে থাকতে পোষ মেনে গেছে।

কিন্তু যা হয়, মহাদেব কারো কথা শোনার পাত্র নয়। ছেলেরা উচাটনে আছে। কিছু বলতেও পারছেন না। খুঁজতে যেতে হয়। বাড়ির সবাই বের হয়ে পড়ল। শ্যালোর ঘর থেকে হরমোহনও

উঠে এল। ওরা রাস্তায় নেমে কিছুদূর যেতেই শুনল, ড্রিম ড্রিম বাদ্য বাজছে। শব্দটা এদিকেই এগিয়ে আসছে।

বুমবাইর বড়দা ছুটে এসে বলল, বাবা, শোনা যাচ্ছে?

—হ্যাঁ, আমিও শুনতে পাচ্ছি। তোরা এত উতলা হস না। ওর কাগা নেত্য বগা নেত্য সবাইকে দেখাতে না পারলে জীবনে তার বেঁচে থাকার কোন অর্থ হয় না। যে যেমন ভাবে বাঁচতে চায়। মহাদেবটা কেন যে থানায় গেল!

এদিকেই আসছে।

দূরে খালের ধারে ওদের দেখা গেল। ধামসা বাজাচ্ছে বিন্দা। কাক বকের ডাক। আজব পোশাক পরে বিন্দা সবাইকে নিয়ে সং বের করেছে।

বুমবাইর জেঠু ইজিচেয়ার থেকে উঠলেন। সামনের উঠোনে বেতের চেয়ার পড়ে আছে সব। তিনি তার পুত্রকে ডেকে বললেন, ওগুলো তুলে ফেল। বিন্দা আসছে।

বুমবাইর এক পিসি এসে খবর দিল, দাদা, শিগগির এস। কী কাণ্ড! গা থেকে একটা লোকের আগুন বের হচ্ছে।

বুমবাইর জেঠু সব জানে। বিন্দা আঠা দিয়ে গায়ে জোনাকি পোকা আটকে দেয়। তারাই জ্বলে। তিনি বললেন, জ্বলতে দে। ওরা সব সঙ্গে আছে তো?

—সবাই আছে। অপু কাক সেজেছে। বাবলু বক!

—তোরা বোস বারান্দায়। দেখ কী মজা!

রাস্তায় কিচিরমিচির শব্দ। উঠোনের আলো জ্বেলে দেওয়া হয়েছে। বিন্দা এসেই হুপ করে লাফিয়ে পড়ল। আর হেলে দুলে নাচতে থাকল। চারপাশের কাক বক ময়না—বোঝার উপায় নেই কে কি সেজেছে! তবে অরুকে চেনা যায়।

সে ছুটে এসেই জেঠুর কোলে উঠে বসে পড়ল।

বুমবাই ঈগল পাখি। সে লাফাতে লাফাতে এসে ইগ ইগ্

করতে থাকল। ঈগল পাখি, কথা বলবে কী করে! অরু, জেঠুর কোলে উঠে বসে থাকলে চলবে কেন! সং সেজে সবাই নাচছে। বুমবাই ক্ষেপে গেছে অরুর আচরণে!

জেঠু বলল, বিন্দা রাগ করবে। যা।

বিন্দার জন্য ভারি কষ্ট হয় বুমবাইর জেঠুর। সংসারে তার কেউ নেই। ছিল ছোট্ট একটা মেয়ে, সেও মরে গেল। সে এখন এ-সব নিয়েই থাকে। এটাই তার জীবন। কোন্ দেশের মানুষ বিন্দা, কোথায় এসে নিজের সেই শৈশবকে ভুলতে পারেনি। কর্তার বাড়িতে এত ছেলেপুলে—বড় শখ তার শৈশবের মতো সং সেজে কাগা বগার নেত্য দেখায়। কিন্তু মহাদেবটা যে কেন থানায় গেল!

বিন্দা পাগলের মতো ধামসা বাজাচ্ছে আর নাচছে। নাচছে কোমর বাঁকিয়ে। হেলে দুলে, এক পা পেছনে রেখে, সামনে এক পা, ঘুংগুর বাজছে পায়ে। আশ্চর্য এক জীবনের ছবি, ছন্দ তাল অতীব কৌতূহল সৃষ্টি করে। এমন একটা নির্জন পৃথিবীতে মানুষের জন্য হরেক মজার দরকার। বিন্দা এই মুল্লুকের এমনি এক মজা। রাতে কোন্ বাড়িতে কখন যে সে উঠে যায় একা, এবং নাচতে থাকে, ইদানিং পয়সা নেয় না, ভিক্ষা নেয় না—সে নাচতে পারলেই খুশি!

বুমবাইর জেঠুর মনে হয় আসলে বিন্দা প্রকৃতির বন-জঙ্গলের মতোই সজীব শিল্পী। মাথায় এক একদিন এক একরকমের পালা গজায়। আজ সীতাহরণের পালা সে শুরু করেছে, নাচের মুদ্রায় প্রকাশ পাচ্ছিল। শেষে জটায়ু বধ। এবং এ-সময়েই কে বলল, মহাদেব দাদু ফিরেছে। থানা থেকে পুলিস আসছে।

পুলিসের কথা শুনতেই বিন্দার নাচ থেমে গেল। মুখ থেকে খুলে পড়ল মুখোশ। আলখাল্লা খুলে ফেলল। গলা থেকে ধামসা নামিয়ে একেবারে হাল্কা হয়ে গেল—তারপর সে সব ফেলে জ্যোৎস্নায় নির্জন মাঠের মধ্যে এক দৌড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। পুলিসকে যমের মতো ভয় পায় বিন্দা।

বিন্দা পাগলের মতো ধামসা বাজাচ্ছে আর নাচছে। [পৃঃ ৯৩

বিন্দা সেই যে গেল আর খোঁজ পাওয়া গেল না।

বিন্দার খোঁজে জেঠুর ক'দিন নাওয়া খাওয়া পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গেল। তাকে আর সত্যি খুঁজে পাওয়া গেল না।

জেঠুর মনমেজাজ খারাপ। বুমবাইর মনে হলো জেঠুর জীবনের সঙ্গে বিন্দেশ্বরের কোথায় যেন মিল আছে। এক জীবনে মানুষের সব থাকে। আর এক জীবনে মানুষ সব হারায়। জেঠুর এখন হারাবার পালা।

জেঠু বিন্দেশ্বরের সব মুখোশ ঘরে তুলে দেয়ালে সাজিয়ে রাখল। এক একটা মুখোশ এক এক রকমের। কত যত্ন নিয়ে বিন্দা নিজের জীবনের কথা ভুলে সোলার মণ্ড দিয়ে মুখোশগুলো তৈরি করেছে। এই মুখোশগুলোই ছিল বিন্দার শেষ জীবনের সম্বল। মুখোশের রঙ আশ্চর্য সজীব। পাতার রস, ফুলের রস মধুতে ভিজিয়ে সে রঙ বানাত। নীল সবুজ হলুদ লাল, যেখানে যে রঙ দরকার বিন্দা মুখোশে লাগিয়েছে। কাকের, বকের, দৈত্যের মুখোশ সব।

এক সকালে বুমবাই দেখল জেঠু ময়না পাখির মুখোশের দিকে অপলক তাকিয়ে কাঁদছে। জেঠুকে সে কখনও কাঁদতে দেখেনি। মুখোশটা পরে অরু উঠোনে দুরন্ত নেচেছে। আজই বড়দা, অরু, বৌদি চলে যাবে সে টের পেল। গাড়িতে সব তোলা হচ্ছে। অরুকে নিমেষের জন্য জেঠু চোখের আড়ালে যেতে দিচ্ছেন না। দিদিভাই দিদিভাই বলে কেবল পাগলের মতো আদর করছেন। মুখোশটা এখন স্মৃতি হয়ে জেঠুর দেয়ালে শুধু শোভা পাবে।

বুমবাইরও মন খারাপ। আর কেউ তাকে কোনদিন যেন আংকল বলে ডাকবে না। মাঠে, গাছের ছায়ায়, পুকুরের পাড়ে আর কোনদিন সে অরুকে নিয়ে ছোটাছুটি করতে পারবে না। লুকোচুরি খেলতে পারবে না। গাড়িটা চলে যাবার সময় অরু হাত নাড়ল। বুমবাই হাত নাড়ল। গাড়িটা যতক্ষণ দেখা গেল বুমবাই জেঠুর পাশে দাঁড়িয়ে থাকল। তার আজ কেন এত কান্না পাচ্ছে

বুঝতে পারল না। বুমবাই গাছতলায় দাঁড়িয়ে আজ প্রথম এক আশ্চর্য কষ্ট অনুভব করল অরুর জন্য। সেও গোপনে আজ জেঠুর মতো সারাক্ষণ কেঁদেছে। অরু বলেছে তাকে চিঠি লিখবে বাংলাতে। সুন্দর চিঠি। অরু আর সোন্দর বলে না।

যাবার দিন বুমবাইও জেঠুকে প্রণাম করতে গিয়ে ভ্যাক করে কেঁদে দিল। এখন থেকে জেঠু আবার একা। জেঠু তাঁর আজব দেশে বেঁচে থাকবেন নিজের মতো। পাশে নিজের কেউ থাকবে না। অরুর জন্য তার এখন আর এক কষ্ট। এটা যে কী কষ্ট নিজেও ঠিক বুঝতে পারছে না। গাড়ির জানলায় বসে সে শুধু শুনতে পাচ্ছে ঝিকঝিক ঝুমঝুম—রেলগাড়ি দুরন্ত বেগে ছুটছে। তার চোখ জলে ভেসে যাচ্ছে। কার জন্য! জেঠু, বিন্দা না অরু ঠিক বুঝতে পারছে না।

———